POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

اِنَّ اَوَّلَ بَيۡتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىۡ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلۡعٰلَمِيۡنَ ۞ فِيۡهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبۡرٰهِيۡمَ ۚ وَمَنۡ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا (آل عمران:97-98)

নিশ্চয় মানব জাতির জন্য সর্ব প্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল তাহা হইল বাক্কাতে, উহা বরকতপূর্ণ এবং হেদায়াতের কারণ-সমগ্র জগতের জন্য । ইহাতে অনেকগুলি সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, - মাকামে ইব্রাহীম (ইব্রাহীমের আবাসস্থল) এবং যে ইহাতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ ।

(আলে ইমরান: ৯৭-৯৮)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّىۡ عَلٰى رَسُوۡلِهِ الۡكَرِيۡمِ وَعَلٰى عَبۡدِهِ الۡمَسِيۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ
وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

সংখ্যা 24

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 13জুন, 2019 9 শওয়াল 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

মানুষের অন্তর অর্থাৎ 'রিবাত'ও প্রশিক্ষিত হওয়া দরকার। আর তার শক্তিবৃত্তির বিচরণ যেন আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যেই বাঁধা থাকে।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

রিবাত-এর অর্থ

'রিবাত' ঐ সকল ঘোড়াদেরকে বলা হয় যেগুলি শত্রু সীমানার প্রান্তে বাঁধা থাকে। আল্লাহ্‌ তা'লা সাহাবাদেরকে শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন আর এখানে 'রিবাত' শব্দের দ্বারা তাদেরক সবদিক থেকে যথাযথ প্রস্তুতির গ্রহণের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তাদের উপর দুটি দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। এক বাহ্যিক শত্রুর মোকাবেলা করা, আর দ্বিতীয়ত আধ্যাত্মিক যুদ্ধ। অভিধানে লেখা আছে, রিবাত শব্দ দ্বারা হৃদয় ও আত্মাকেও বোঝানো হয়। আরও একটি সূক্ষ্ম বিষয় লক্ষ্যনীয় এই যে, একমাত্র প্রশিক্ষিত ঘোড়াই কাজে আসে। বর্তমান যুগে ঘোড়াদের এমনভাবে প্রশিক্ষন দেওয়া হচ্ছে যেভাবে বাচ্চাদেরকে স্কুলে যত্ন সহকারে শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। যদি তাদেরকে প্রশিক্ষন না দেওয়া হয়, তারা নিষ্কর্মা হয়ে পড়ে, আর কল্যাণকর না হয়ে ভয়াবহ ও ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়।

এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের অন্তর অর্থাৎ 'রিবাত'ও প্রশিক্ষিত হওয়া দরকার। আর তার শক্তিবৃত্তির বিচরণ যেন আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা মধ্যেই বাঁধা থাকে। আর যদি এমনটি না হয়, তবে সে ঐ সব যুদ্ধের কাজে আসতে পারবে না যা প্রতিটি মূহূর্তে মানুষ ও তার চিরশত্রু শয়তানের সঙ্গে আভ্যন্তরীণভাবে লেগে আছে। যেরূপে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের ময়দানে শারিরিক শক্তির পাশাপাশি প্রশিক্ষিত হওয়াও জরুরী, অনুরূপভাবে এই অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ ও সংগ্রামের জন্য মানুষের মনকে প্রশিক্ষিত করা এবং উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়াও আবশ্যক। আর এমনটি না হলে শয়তান তার উপর বিজয়ী হবে আর খুব খারাপভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হবে। উদাহরণ স্বরপ কোন ব্যক্তি যদি নিজের অস্ত্রভান্ডারে তোপ, গোলা, ও বিভিন্ন প্রকারের বন্দুক রাখে কিন্তু চালানোর পদ্ধতি না জানে, তবে সে শত্রুর মোকাবেলায় কখনও সফল হবে না। অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি বন্দুক ও বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত হয় এবং সেগুলি চালনা করতেও জানে, কিন্তু যদি তার বাহুতে শক্তি না থাকে, তবে এমন ব্যক্তিও অসফল হবে। এর থেকে বোঝা গেল যে, কেবল ব্যবহারের পদ্ধতি আয়ত্ব করলেও তা কাজে আসতে পারে না, যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি শারিরিক কসরত ও অনুশীনের মাধ্যমে বাহুপেশি গুলিকে সবল ও বলিষ্ঠ না করে তোলে। আবার যদি এক ব্যক্তি তরবারি চালনা করতে জানে, কিন্তু কসরত ও অনুশীলন করে না, তবে এমন ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে তিন-চার বার তরবারি চালনা ও কয়েকটি ঘা দেওয়া মাত্র তার বাহু নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে এবং ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে অকেজো হয়ে পড়বে। আর অবশেষে নিজেই শত্রুর শিকারে পরিণত হবে।

আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ও সাধনা

অতএব ভালভাবে বুঝে যাও, কেবল জ্ঞান ও কৌশল এবং থিয়োরিটিক্যাল প্রশিক্ষণ কোন কাজে আসে না। যতক্ষণ এগুলির সঙ্গে বাস্তবায়বন, প্রচেষ্টা এবং অনুশীলন সংযুক্ত না হয়। তাই লক্ষ্য করা উচিত যে, ঠিক এই কারণেই সরকার সেনাবাহিনীকে অলসভাবে বসে থাকতে দেয় না। এমনকি শান্তি ও স্বাচ্ছন্দের দিনগুলিতে কৃত্রিম যুদ্ধাভ্যাস করিয়ে সেনাকে ব্যস্ত রাখে। এছাড়াও সঙ্গে দৈনন্দিন অনুশীলন ও প্যারেড তো আছেই।

যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি, যুদ্ধের ময়দানে সফল হতে হলে একদিকে যেমন অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষন ও জ্ঞান থাকা দরকার, অন্যদিকে অনুশীলন ও কায়িক পরিশ্রমকে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কাজে লাগানোও ভীষণভাবে প্রয়োজন। এছাড়াও যুদ্ধ প্রাঙ্গণে চাই প্রশিক্ষিত ঘোড়া-এমন ঘোড়া যারা তোপ ও বন্দুকের শব্দে ভয় পাবে না আর ধুলোবালির প্রকোপে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলেও বিশৃঙ্খল হয়ে পিছিয়ে আসবে না, বরং ক্রমশ এগিয়েই চলবে। অনুরূপভাবে মানুষের মনও কঠোর অনুশীলন, নিরলস পরিশ্রম ও সর্বোত্তম প্রশিক্ষন ছাড়া আল্লাহ্‌র শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে সফল হতে পারে না।

আরবী ভাষার বৈশিষ্ট

আরবী ভাষা অনন্য ও অতুলনীয়। উপরোক্ত আয়াতে যে রিবাত শব্দটি এসেছে সেটি একদিকে যেমন জাগতিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং যুদ্ধের কলা-কৌশলকে নির্দেশ করে, তেমনি অপরদিকে মানুষের অভ্যন্তরে চলতে থাকা আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ও সাধনার বৈশিষ্টকেও প্রকাশ করে। এটি এক অসাধারণ বিষয়। এই কারণেই আরবী ভাষা হল 'উম্মুল আলসিনা' বা ভাষাসমূহের জননী। এর দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ করা যায়, তা অন্য কোন ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ইনশাআল্লাহ এই তত্ত্বজ্ঞান অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সকল সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকেও আমার পুস্তক 'মিনানুর রহমান' পুস্তকে প্রকাশিত হবে, যা ইদানিং আমি আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব এবং সেটিকে 'উম্মুল আলসিনা' বা ভাষাসমূহের জননী হিসেবে প্রমাণ করার জন্য লেখা আরম্ভ করেছি। এর থেকে বোঝা যাবে যে, এ বিষয়ে ইউরোপিয়ানদের গবেষণা ত্রুটিতে ভরা এবং একেবারেই অসম্পূর্ণ। আর তারাও জেনে যাবে যে, ভাষাসমূহের হারিয়ে যাওয়া মাকে খুঁজে পাওয়া গেছে, যেরূপে অন্যান্য ধর্মীয় সত্যতা উন্মোচিত হয়েছে। আরবীই হল সেই হারিয়ে যাওয়া ভাষা।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৭-৪৯)

১২৫ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্‌ আল খামেস (আইঃ) ২০১৯ সালে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিতব্য জলসা সালানার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৭, ২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর ২০১৯ (যথাক্রমে- শুক্র, শনি ও রবিবার)। আশিসমণ্ডিত এই জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন আর পাশাপাশি দোয়াও করুন যেন আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করেন। এই জলসা সালানা যেন সার্বিকভাবে সফল ও আশিসমণ্ডিত হয়, এবং সৎ প্রকৃতির মানুষের হেদায়েতের কারণ হয়, সেই উদ্দেশ্যে দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ ওয়া আহসানুল জাযা। (নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ

মৌলভী গোলাম নবী সাহেব নিয়ায, মুবাল্লিগ ইনচার্জ জম্মু ও কাশ্মীর

মহা শক্তিমান খোদা তা'লা এই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডকে বৃথা সৃষ্টি করেন নি, বরং এর সৃষ্টির পেছনে মহান উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায় আর সেটি হল তাঁর পরিচয় লাভ করা।

হাদিসে কুদুসিতে বর্ণিত আছে,

"كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ آدَمَ" অর্থাৎ আমি একটি গোপন ধন-ভান্ডার ছিলাম। আমি নিজের পরিচিতি লাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। এই উদ্দেশ্যে আমি আদমকে সৃষ্টি করলাম।

সুতরাং আদমকে আল্লাহ তা'লার পরিচিতি লাভের মাধ্যম বানানো হল। আল্লাহ তা'লার জ্যোতির্বিকাশ আদমের সত্তার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে, যার অস্তিত্ব শত-সহস্র পর্দার অন্তরালে, যিনি সমস্ত প্রশংসা, সৌন্দর্য্য এবং উচ্চ-গুণাবলীর ধারক। যেরূপ তিনি কুরান মজীদে ফিরিশতাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً (আল-বাকারা:৩০-৩২)

" আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি তৈরী করতে চলেছি। তখন তারা অর্থাৎ ফিরিস্তারা নিজেদের সীমিত জ্ঞানের কারণে আশঙ্ক প্রকাশ করেন। আল্লাহ তা'লা তাদের আশঙ্কাকে অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে নিবারণ করেন এবং আদমের সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন। সুতরাং তারা আল্লাহ তা'লার গুণকীর্তন করার মাধ্যমে সত্যকে স্বীকার করেন"

মোটকথা আল্লাহ তা'লার এই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডকে সৃষ্টি করা এবং এর মধ্যে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করা খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্বকে স্পষ্ট করে।

খিলাফতের অর্থ:

খলীফা শব্দের অর্থ হল প্রতিনিধি এবং খিলাফতের অর্থ হল প্রতিনিধিত্ব। আল্লামা ইবনের কাসীর লিখেছেন , ' খলীফা সেই ব্যক্তি যে কারোর প্রস্থান করার পর তার স্থানে দন্ডায়মান হয় এবং তার প্রস্থানে কারণে সৃষ্ট শুন্যকে পুরন করে'। আভিধানিক দিক থেকে খিলাফতের অর্থ সহায়ক এবং প্রতিনিধি। ইসলামের পরিভাষায় নবীর মৃত্যুর পর খিলাফত আরম্ভ হয়।

(আন নিহায়ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩১৫)

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন,

"খলীফা শব্দের অর্থ হল প্রতিনিধি যে ধর্মের সংস্কারের করে। নবীর যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর যে অন্ধকার বিরাজ করে তা দূর করার উদ্দেশ্যে তাদের স্থানে যে আগমণ করে তাকে খলীফা বলে"।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৭৩)

তিনি (আঃ) খিলাফতের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

" যেহেতু কোন মানুষ চিরঞ্জীব নয়। অতএব, খোদা তা'লা রসুলদের সত্তাকে প্রতিচ্ছায়া রূপে চিরকালের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখা স্থির করেছেন যারা সমস্ত পৃথিবীর সৃষ্টিদের থেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। এই উদ্দেশ্যেই খোদা তা'লা খিলাফতের সূচনা করেন যাতে পৃথিবী কখনও কোন যুগেও নবুয়তের বরকত থেকে বঞ্চিত না থাকে।"

(শাহাদাতুল কুরান, পৃষ্ঠা-৫৭)

সমস্ত নবীগণ আল্লাহ্‌র খলীফা ছিলেন:

হযরত আদম থেকে শুরু করে হযরত আকদস মহম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত যত সংখ্যক নবী পৃথিবীতে আগমণ করেছেন তারা সকলেই আল্লাহ্‌র খলীফা ছিলেন। তাঁরা সকলেই দ্বীনে ইসলামের শিক্ষা দিয়েছেন, পার্থক্য কেবল এতটুকুই ছিল যে, পূর্বের নবীগণ একটি বিশেষ কোন যুগ এবং বিশেষ একটি জাতির জন্য নির্দিষ্ট ছিলেন। সুতরাং সময়ের প্রয়োজন অনুসারেই তাদের শিক্ষা ছিল। আঁ হযরত (সাঃ) সমগ্র মানবতার জন্য রসুল রূপে আবির্ভুত হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'লা কুরান মজীদে বলেন, قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا (আল-আরাফ:১৫৯)

অর্থাৎ "তুমি বলে দাও, হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রসুল।"

অতএব এই পৃথিবীতে আঁ হযরত (সাঃ)- এর সত্তা ঐশী জ্যোতির্বিকাশের পূর্ণতম দৃষ্টান্ত। তিনি একটি সম্পূর্ণ কর্মবিধি ও জীবনাদর্শ নিয়ে এসেছেন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা ধর্মকে পূর্ণতা প্রদান করেছেন। যেরূপ তিনি বলেন, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (আল-মায়েদা: ৪)

আল্লাহ তা'লা আঁ হযরত (সাঃ)-এর মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এবং একে পূর্ণতা দান করেছেন। শুধু পূর্ণতা দানই করেন নি বরং এর নিরাপত্তার অঙ্গীকারও করেছেন। -اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

(আল-হিজর: ১০)

অর্থাৎ আমরাই এই কুরানকে অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এটির সুরক্ষা করব। আল্লাহ তা'লা আঁ হযরত (সাঃ)-এর কাছেও এই অঙ্গীকার করেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত মুসলমানেরা ঈমান ও সৎকর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ তা'লা তাদের মধ্যে খিলাফতও প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। যেরূপ কুরান মজীদে আয়াতে ইসতেফলাফ'-এ (আন-নুর: ৫৬) আল্লাহ তা'লা বলেন,

" অর্থাৎ তোমাদের ম্যধ হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং অবশ্যই তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের দ্বীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন যাহাকে তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, এবং তাহদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর উহাকে তিনি তাহাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করিয়া দিবেন; তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করিবে না। এবং ইহার পর যাহারা অস্বীকার করিবে, তাহারাই হইবে দুষ্কৃতকারী।"

সুতরাং উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'লা হযরত আকদস মহম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতে তাঁর পর সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত খিলাফতের অঙ্গিকার করেছেন। অতএব খিলাফত হল নবুয়তের পরিপুরক অধ্যায়। এই কারণে আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন, مَا كَانَتْ نُبُوَّةٌ قَطُّ اِلَّا تَبِعَتْهَا خِلَافَةٌ (কুনযুল আমাল)

অর্থাৎ নবুয়তের পর খিলাফত হওয়া আবশ্যক। এই দুটিই একে অপরের পরিপুরক। নবীগণ কেবল বীজ বপন করে থাকেন এরপর সেই চারা বৃক্ষের পরিচর্যা করেন খলীফাগণ। যেভাবে ভু-স্বামীরা নিজের ক্ষেতে এবং বাগানে বীজ বপন করে থাকে বা চারা গাছ রোপন করে থাকে এবং পরবর্তীতে সেগুলি সুরক্ষার ব্যবস্থাও করেন। এইভাবে তাদের ক্ষেতের ফসল পরিপক্ক হয়। অতএব এটি কিভাবে সম্ভব যে, খোদা তা'লা একত্ববাদের বীজ নবীগণের হাতে বপন করানোর পর তার জন্য কোন তত্বাবধায়ক নিযুক্ত করবেন না?

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন,

" অনুরূপভাবে খোদা তা'লা শক্তিশালী নিদর্শনের দ্বারা তাঁর সত্যতা প্রকাশ করে দেন এবং যে সাধুতা তাঁরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, খোদা তা'লা তার বীজ তাঁদের হাতেই বপন করেন। কিন্ত তাঁদের হাতে এর পূর্ণতা দান করেন না। বরং এমন সময়ে তাঁকে মৃত্যু দান করেন যখন বাহ্যিকভাবে এক প্রকার অকৃতকার্যতাব্যঞ্জক ভীতি বিদ্যমান থাকে এবং তিনি বিরোধীদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও উপহাসের সুযোগ এনে দেয়। এরপর আল্লাহ তা'লা স্বীয় কুদরতের অপর একটি হাত প্রদর্শন করেন। এবং এমন সব উপকরণ সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে সেসব উদ্দেশ্য, যার কোন কোনটি অসম্পূর্ণ রয়েছিল, সেগুলিও পূর্ণতা পায়।" (আল-ওসিয়্যত)।

অতএব নবুয়তের মহান উদ্দেশ্যের পূর্ণতার জন্য প্রতিনিধিত্ব বা খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকা একান্ত আবশ্যক। খিলাফতের মাধ্যমেই দ্বীনের মধ্যে সুস্থিরতা এবং মু'মেনীনদের মধ্যে অবিচলতা ও ঐক্য সম্ভব। নিম্নে প্রদত্ত আঁ হযরত (সাঃ)-এর হাদিসগুলি এর জন্য সর্বোত্তম পথ-প্রদর্শক।

(অবশিষ্টাংশ পরের সংখ্যায়)

জুমআর খুতবা

‘আল খায়রু কুল্লুহু ফিল কুরআন’ অর্থাৎ যাবতীয় প্রকারের কল্যাণ কুরআনে বিদ্যমান।

‘প্রকৃত মোমেন বড় বড় কুরবানী করেও ভীত থাকে, আর খোদা কখন ও কিভাবে সন্তুষ্ট হবেন সেই চেষ্টায় রত থাকে।

“কল্যাণের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা’লা রোযা আমাদের উপর বিধিবদ্ধ করেছেন”

রোযা মানুষের স্বাস্থ্যের উপরও সুখকর প্রভাব ফেলে।

রোযার কল্যাণে মানুষের জীবনে নিয়মানুবর্তিতা আসে।

রোযার উদ্দেশ্য হলো, মানুষের এক খাদ্য যা দেহের লালন করে তা পরিত্যাগ করে অপর খাদ্য গ্রহণ করা যা আত্মার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির কারণ হয়।

আমরা আনন্দিত হয়ে রমজান আসার কারণে কেবল শুভেচ্ছা যেন বিনিময় না করি বরং আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আল্লাহ্ রমজানের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন তা অর্জনের চেষ্টা আমরা করছি কিনা।

তোমাদের সকল উন্নতি ও মুক্তির উৎস হল কুরআনে। তোমাদের ধর্মীয় এমন কোন প্রয়োজন নেই যা কুরআন পূর্ণ করে না। কুরআন কেয়ামতের দিন তোমাদের ঈমানের সত্যায়নকারী বা ঈমানকে মিথ্য প্রমাণকারী হবে কুরআন। তাই কুরআন ভিন্ন আকাশের নিচে অন্য কোন (ঐশী) গ্রন্থ নেই যা কুরআনের মাধ্যম ব্যতিরেকে তোমাদের পথ প্রদর্শন করতে পারে।

সেই ব্যক্তিই মোমিন যে স্থায়ীভাবে পুণ্যকর্মের সন্ধানে রত থাকে এবং সেগুলিকে অব্যাহত রাখে।

যদি দোয়া কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি থাকে, তবে সেই ত্রুটি আমাদের মধ্যেই রয়েছে। খোদা তা’লার বাণী কখনও ভুল হতে পারে না।

রমযানুল মুবারক প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াতসমূহ, হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বাণীর আলোকে রোযার বিধিবদ্ধতা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য, মোমেনদের কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং দোয়া কবুল হওয়ার পন্থা সম্পর্কে প্রজ্ঞাপূর্ণ বর্ণনা।

জামাতে আহমদীয়ার শত্রুদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে, মুসলমান জাতির পারস্পরিক সমন্বয় এবং সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংসের পথ থেকে রক্ষা করার জন্য দোয়ার আহ্বান।

ইসলামাবাদের (পাকিস্তান) ডাক্তার তাহির আযিয সাহেব এবং আমেরিকার মাননীয় ডাক্তার ইফতেখার সাহেবের মৃত্যু সংবাদ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১০ ই মে, , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (১০ হিজরত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ পাঠ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ○ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ○ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ○ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ○
(سورۃ البقرہ:184 تا 187)

(সূরা আল্ বাকারা: ১৮৪-১৮৭)

এই আয়াতগুলোর অর্থ হলো- হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ওপরও রোযা রাখা সেভাবেই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমারা তাকওয়া অবলম্বন কর, আর আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাক। অতএব তোমরা রোযা রাখ হাতে গোণা কয়েক দিন। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে অসুস্থ অথবা সফরে থাকে তার অন্যান্য দিনে রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। আর যারা এর অর্থাৎ রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে না তাদের জন্য সামর্থ্য থাকলে ফিদিয়াস্বরূপ একজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো আবশ্যক। অতএব যে ব্যক্তি পূর্ণ আনুগত্যের সাথে কোন পুণ্যকর্ম করে, তা তার জন্য উত্তম। আর যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে, তোমাদের রোযা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম।

রমজান মাস হলো সেই মাস যার সম্পর্কে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, সেই কুরআন যা সমগ্র মানব জাতির জন্য হেদায়েতরূপে প্রেরিত হয়েছে, অথবা যাতে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা স্পষ্ট যুক্তি ও প্রমাণাদিতে সমৃদ্ধ, এমন যুক্তি-প্রমাণ যা সঠিক পথের দিশা দেয়। আর একইসাথে পবিত্র কুরআনে ঐশী নিদর্শনও রয়েছে। তাই তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি এই মাসকে এই অবস্থায় পায় যে, সে অসুস্থও নয় আর মুসাফিরও নয়, তার উচিত সে যেন এতে রোযা রাখে। আর যে ব্যক্তি অসুস্থ বা সফরে থাকে তার জন্য অন্যান্য দিনে এই গণনা পূর্ণ করা আবশ্যক হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য বা সহজসাধ্যতা চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না। আর এই আদেশ তিনি এ জন্য দিয়েছেন যেন তোমরা কষ্টের সম্মুখীন না হও এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর, আর এজন্য আল্লাহ্ তা’লার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর কেননা তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন, এবং যেন তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আর হে রসূল! আমার বান্দারা যখন তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন বল, আমি তাদের নিকটেই রয়েছি। প্রার্থনাকারী যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে তখন আমি তার প্রার্থনা

গ্রহণ করি। সুতরাং সেই প্রার্থনাকারীদেরও উচিত তারা যেন আমার আদেশ মান্য করে এবং আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করে, যেন তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়।

এই আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'লা রোযার আবশ্যকতা, এর গুরুত্ব, এই মাসে মু'মিনদের দায়িত্বাবলী এবং দোয়া কিভাবে গৃহীত হতে পারে-তা বর্ণনা করেছেন। তিনি এমন একটি মাস আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন যাতে খোদা তা'লা বান্দার সবচেয়ে কাছে এসে যান আর শয়তানকে তিনি শিকলাবদ্ধ করেন। অতএব যেখানে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য এত বেশি কৃপা ও অনুগ্রহের দ্বার খোলা হচ্ছে সেখানে আমাদের কত সচেতনতার সাথে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মান্য করে যথাযথভাবে রোযা রাখার চেষ্টা করা উচিত! মহানবী (সা.) এক উপলক্ষ্যে বলেন, তোমাদের যদি জানা থাকে যে, রমজানে কী কী কল্যাণরাজি অন্তর্নিহিত আছে আর আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে এবং কতটা তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হন তাহলে তোমরা এই বাসনা করতে যেন সারা বছরই রমজান হয়। পুরো বছর জুড়েই যেন আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা লাভ করতে থাকি। অতএব আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরই উপকারার্থে আমাদের জন্য রোযা বিধিবদ্ধ করেছেন। আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক সকল প্রকার কল্যাণ আমরা রোযার মাধ্যমে লাভ করতে পারি। এখন তো অমুসলিম ডাক্তাররাও এ কথা স্বীকার করছে, পূর্বে তাদের সংখ্যা দু'একজন ছিল, এখন এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাদের দাবি, রোযার মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর সুখকর প্রভাব পড়ে। বরং কতিপয় অমুসলিম এখন এ কথা লিখতে আরম্ভ করেছে যে, রোযার মাধ্যমে মানুষের জীবনে শৃঙ্খলাও সৃষ্টি হয়। যাহোক এই জগৎপূজারীরা বলুক বা না বলুক, এক প্রকৃত মু'মিনের এই অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, রোযা যেখানে এক মু'মিনের দৈহিক অবস্থাকে উন্নত করে সেখানে তার চেয়ে আরো অনেক বেশি আধ্যাত্মিকভাবেও তার অবস্থায় উন্নতি সাধনের কারণ হয়। অতএব আমাদের আল্লাহ্ তা'লার এই আদেশের ওপর আমল করে রমজান মাসে নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থায় উন্নতি সাধনের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত।

এই আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'লা যেসব বিষয় বর্ণনা করেছেন সেগুলো হলো, প্রত্যেক মু'মিন এবং প্রত্যেক প্রকৃত মুসলমানের জন্য রোযা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনাহারে কাটানোর নাম রোযা নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এর (অর্থাৎ রোযার) মাধ্যমে খোদা তা'লার ইচ্ছা হলো এক খাবার কমিয়ে অপর খাবার বৃদ্ধি কর। রোযাদারের সর্বদা এটি দৃষ্টিপটে থাকা উচিত যে, এর (অর্থাৎ রোযার) অর্থ শুধু এটিই নয় যে, অনাহারে থাকবে, বরং তার খোদা তা'লার স্মরণে মগ্ন থাকা উচিত যেন 'তাবাত্তুল ও ইনকিতা' অর্জন হয়, অর্থাৎ খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক এবং তাঁর ইবাদত ও স্মরণের ক্ষেত্রে মানুষ যেন উন্নতি করে আর জগতের প্রতি আকর্ষণ যেন হ্রাস পায়। জাগতিক কাজকর্ম তো লেগেই থাকে, সেগুলো থেমে যায় না, কিন্তু তা করার সময়ও যেন খোদা তা'লাকে স্মরণ রাখা হয়, তাঁর নির্দেশাবলীর প্রতি দৃষ্টি থাকে, তাঁর স্মরণ যেন অব্যাহত থাকে। তিনি বলেন, অতএব রোযার উদ্দেশ্য হলো, মানুষের এক খাবার যা দেহের লালন করে তা পরিত্যাগ করে অপর খাবার হস্তগত করা যা আত্মার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির কারণ হয়। যারা কেবল প্রথাগতভাবে নয় বরং শুধুমাত্র খোদার খাতিরে রোযা রাখে তাদের উচিত আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন এবং একত্ববাদের ঘোষণায় ব্যাপৃত থাকা।

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১২৩)

মহানবী (সা.)ও বলেছেন যে, তোমাদেরকে অনাহারে রাখার আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই। (সহী আলবুখারী, কিতাবুস সওম)

তোমাদের জন্য রোযা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে-এই কথা বলার পর তিলাওয়াতকৃত প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রোযা এজন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। আর তাকওয়া কী জিনিস? তাকওয়া হলো, তোমরা যেন আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাক। যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদেরকে অনাহারে রাখার আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই। যতক্ষণ রোযা তোমাদের মাঝে তাকওয়ার সেই মান সৃষ্টি না করবে, যার মাধ্যমে তোমরা সকল প্রকার আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকতে পার, রোযা রাখা অর্থহীন। আর তাকওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে লিখেন-

"মুত্তাকী হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো বড় বড় পাপ যেমন-ব্যভিচার, চুরি, অধিকার হরণ, প্রদর্শনমুখিতা, কৃত্রিমতা, আত্মশ্লাঘা, মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, কৃপণতা ইত্যাদি পরিত্যাগের ক্ষেত্রে দৃঢ়চিত্ত হওয়া, (অর্থাৎ এই যে মন্দ বিষয় সমূহ রয়েছে এগুলো পরিত্যাগের ক্ষেত্রে দৃঢ়চিত্ত হওয়া) আর নোংরা বা হীন অভ্যাস পরিত্যাগ করে এর বিপরীতে মহান নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে উন্নতি করা, (অর্থাৎ প্রশংসনীয় স্বভাব চরিত্রের অধিকারী হওয়া।) মানুষের সাথে দয়ার্দ্র আচরণ করা, তাদের প্রতি দয়া, সদ্ব্যবহার ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করা। উন্নত নৈতিক গুণাবলী অর্জন করা। খোদা তা'লার প্রতি সত্যিকার বিশ্বস্ততা ও একনিষ্ঠতা প্রদর্শন করা। এটিও তাকওয়ার জন্য এবং আধ্যাত্মিকতার জন্য আবশ্যকীয় যেন আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার বিশ্বস্ততা থাকে এবং সত্যিকার সম্পর্ক থাকে। সেবার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় মর্যাদায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা। আল্লাহ্ তা'লার অধিকারের বিষয়টিও এর অন্তর্গত অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নির্দেশ পালন করা, একইসাথে মানুষের সাথে সম্পর্ক এবং তাদের সেবার বিষয়টিও এর অধীনে আসে। (অর্থাৎ সেবা যেন এমন নিঃস্বার্থ হয় যা দেখে মানুষ বলবে যে, আসলেই খোদা তা'লার খাতিরে সেবা করছে। কোন প্রকার ব্যক্তিস্বার্থ যেন না থাকে।) তিনি বলেন, এসব বিষয়ের মাধ্যমেই মানুষ মুত্তাকী হিসেবে অভিহিত হয়। আর যাদের মাঝে এসব গুণাবলী পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে অর্থাৎ যারা এসব বৈশিষ্ট্যকে সমবেত করে তারাই প্রকৃত মুত্তাকী হয়ে থাকে। অর্থাৎ কারো মাঝে যদি বিচ্ছিন্নভাবে এসব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় তাহলে তাকে মুত্তাকী বলা যাবে না, যতক্ষণ উন্নত নৈতিক গুণাবলী সামগ্রিকভাবে তার মাঝে সৃষ্টি না হবে। আর এমন ব্যক্তিদের জন্যই বলা হয়েছে لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (সূরা বাকারা: ৬৩)। অর্থাৎ তাদের কোন ভয়ও থাকবে না আর তারা দুঃখিতও হবে না। আল্লাহ্ তাদেরকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার এই নিশ্চয়তা লাভের পর তাদের আর কী চাই। আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান, যেমনটি তিনি বলেছেন, وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ (সূরা আল্ আরাফ: ১৯৭)। হাদীসে আছে যে, আল্লাহ্ তাদের হাত হয়ে যান যার দ্বারা তারা ধরে। তাদের চোখ হয়ে যান যার দ্বারা তারা দেখে। তাদের কান হয়ে যান যার দ্বারা তারা শোনে। তাদের পা হয়ে যান যার মাধ্যমে তারা চলে। অপর এক হাদীসে আছে- যে আমার ওলীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে আমি তাকে বলছি যে, আমার সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। এক জায়গায় তিনি বলেন, যখন কেউ খোদার ওলী বা বন্ধুর ওপর হামলা করে তখন খোদা তা'লা তার ওপর সেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন যেভাবে এক সিংহীর কাছ থেকে তার শাবক ছিনিয়ে নিলে সে ক্রোধের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪০০-৪০১)

অতএব রোযার শর্ত অনুসারে রোযা রেখে কেউ যদি তাকওয়ার এই মানে উপনীত হয় কেবল তবেই রোযা মানুষকে, এক মুসলমানকে এবং এক মু'মিনকে আল্লাহ্ তা'লার ঢালের নিরাপত্তায় নিয়ে আসে।

হযরত আবু হুরায়রার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রোযা ব্যতিরেকে মানুষের প্রতিটি কর্ম তার নিজের জন্য হয়ে থাকে। অতএব রোযা আমার উদ্দেশ্যে রাখা হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মানুষ আমার সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখে। যারা প্রকৃত মু'মিন তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখে। আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেছেন, যে আমার সন্তুষ্টির জন্য রোযা রখে আমি এর প্রতিদান হয়ে যাই বা আমি তাকে নিজের পক্ষ থেকে যা ইচ্ছা প্রতিদান দেব। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আর রোযা হলো বর্ম। তোমাদের কেউ যদি রোযা রাখে তাহলে সে যেন কামোদ্দীপক কথাবার্তা এবং গালমন্দ করা থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ কোন প্রকার কামোদ্দীপক কথাবার্তা যেন না হয় এবং গালমন্দ যেন না করে। কেউ তাকে গালি দিলে বা তার সাথে কেউ ঝগড়া করলে তার প্রত্যুত্তরে বলা উচিত যে, আমি রোযা রেখেছি। আমি কোন প্রকার বাজে বিষয়ে জড়াব না। এটি বর্ণনা করার পর তিনি (সা.) বলেন, সেই

রসুলের বাণী

নিজের হাতে উপার্জিত জীবিকার চেয়ে উত্তম জীবিকা দ্বিতীয়টি নেই।

(সহী বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

সত্তার কসম, যার নিয়ন্ত্রণে মুহাম্মদ (সা.) এর প্রাণ রয়েছে, রোযাদার ব্যক্তির মুখের গন্ধ আল্লাহর দৃষ্টিতে কস্তুরির চেয়ে বেশি পছন্দনীয়। অর্থাৎ কস্তুরির সৌরভ থেকে উত্তম। তিনি বলেন, রোযাদার ব্যক্তির জন্য দুটো আনন্দ নির্ধারিত রয়েছে যা তাকে আনন্দ দিয়ে থাকে। একটি হলো সে যখন রোযা খোলে তখন আনন্দিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য ইফতারির ব্যবস্থা করেছেন। আর দ্বিতীয়ত সে যখন স্বীয় প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন রোযার কারণে আনন্দিত হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমিই এর প্রতিদান বা আমি তাকে প্রতিদান দেব। আর আল্লাহ্ রোযাদারকে যে অনন্ত প্রতিদান দেবেন সেখানে তার আনন্দের চিত্রই ভিন্ন হবে।

(সহী আল বুখারী, কিতাবুস সওম , হাদীস-১৯০৪)

অতএব এটি হলো তাকওয়ার সেই মান যা একজন প্রকৃত মু'মিনের অর্জন করা উচিত। আর প্রকৃত রোযাদার তা অর্জন করে থাকে। অর্থাৎ রোযা সমস্ত জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত থেকে রাখা উচিত। আর সকল প্রকার আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত থেকে রোযাদার ব্যক্তির দিন কাটানো উচিত। আমি রোযা রেখেছি-এই কথা ভেবে যেন আনন্দিত না হয়ে যায়। পৃথিবীতে অনেক রোযাদার রয়েছে যারা বাহ্যত রোযা রাখে। কিন্তু তাদের নামাযেরও সেই মান নেই যা হওয়া উচিত আর তাদের চারিত্রিক মানও তেমন নয় যেমন হওয়া উচিত।

মহানবী (সা.) যে বলেছেন, এই মাসে শয়তান শিকলাবদ্ধ হয়ে যায়, তাকে বেঁধে দেওয়া হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠে যে, রমজান মাসেও পৃথিবীতে পাপ কেন হয়? রোযা তাদের জন্য ঢালের কাজ দেয়, শয়তানের হামলা থেকে তাদের রক্ষা করা হয় যারা রোযার প্রকৃত মর্ম বুঝে তাকওয়া অবলম্বন করে। সুতরাং এটি রোযার সেই উদ্দেশ্য যা আমদের সব সময় নিজেদের সামনে রাখা উচিত। নতুবা মহানবী (সা.) এটিও বলেছেন যে, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রমজানে জান্নাতের দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হয় জাহান্নামের দ্বারসমূহ রুদ্ধ করে দেওয়া হয় আর শয়তানদের শিকলাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। (সহী মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, হাদীস-১০৭৯)

কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এ কথা বলে সতর্কও করেছেন আর এ কথার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, কেউ যদি রমযজান পায় আর ক্ষমা লাভে ব্যর্থ হয় তাহলে আর কবে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে?

(সুনান আততিরমিযি, আবওয়াবুদ দাওয়াত, হাদীস-৩৫৪৫)

সুতরাং একথা তিনি আমাদের বলছেন, যারা মুসলমান আখ্যায়িত হয় তাদের বলছেন, আর তাদের বলছেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, রোজা তোমাদের জন্য আবশ্যক করা হয়েছে যেন তোমরা এই দিনগুলোতো খোদার ইবাদতের উন্নত মান ও উন্নত নৈতিক মান অর্জনের চেষ্টা কর। কিন্তু যদি তা না কর তাহলে রমজানের আগমন, শয়তান শিকলাবদ্ধ হওয়া, জান্নাতের দ্বার খোলা, জান্নামের দরজায় তালা লাগা কোন কাজে দেবেনা। তিনি সতর্ক করেছেন যে, আল্লাহ তা'লা-র এত ব্যপক রহমত সত্ত্বেও যদি ক্ষমার উপকরণ সৃষ্টি না হয়ে থাকে তাহলে আর কখন তা হবে? সুতরাং আমরা আনন্দিত হয়ে রমজান আসার কারণে কেবল শুভেচ্ছা যেন বিনিময় না করি বরং আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আল্লাহ্ রমজানের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন তা অর্জনের চেষ্টা আমরা করছি কিনা। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে তা অর্জনের তৌফীক দিন আর স্বীয় ক্ষমা ও মাগফিরাতের চাদরে আবৃত রাখুন।

পুনরায় তোমরা কোন্ পরিস্থিতিতে রোযা ছাড়তে পার, পরবর্তী আয়াতগুলোতে তা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তা বলার পূর্বে খোদা তা'লা এটি স্পষ্ট করেছেন যে, আমি রোজার প্রতিদান হয়ে যাই আর মু'মিনদেরকে বিশেষভাবে ক্ষমা করার ব্যবস্থা করি। তাই এই ধারণা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় যে, আমরা রোজা রেখে অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করছি যার কারণে আল্লাহ তা'লার দয়া, স্নেহ ও ক্ষমার চাদর আমাদের ওপর বিস্তৃত করা হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খোদার দয়া ও স্নেহ বিস্তৃত করা হয়েছে। কিন্তু এটি তেমন কোন বড় কুরবানী নয়। সেহরীর সময়ও আমরা পেট ভরে খেয়ে নিই আর ইফতারীর সময়ও প্রত্যেকেই পছন্দ অনুযায়ী খেয়ে নেয়। এটি স্থায়ী কোন কুরবানী নয়। বছরে হাতে গোণা কয়েকটি দিন মাত্র। কেউ কেউ রোযা রেখে বড় গর্বের সাথে বলে যে, আমরা রোযা রেখেছি। স্মরণ রাখবেন, এটি বড় কোন কুরবানী নয় যা প্রকাশ করতেই হবে। বরং সত্যিকার মু'মিন বড় থেকে বড় কুরবানী করেও ভয় পায় যে, খোদা কখন ও কীভাবে সন্তুষ্ট হবেন, প্রকাশ করাতো দূরের কথা। আল্লাহ তা'লা বলেছেন হাতে গোণা কয়েকটি দিন মাত্র। বছরের বারো ভাগের একভাগ। তাই এটি বড় কোন কুরবানী নয়। পুনরায় বলেন, এতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে স্বীয় করুণায় ভূষিত করছেন। এ দিনগুলোতেও অর্থাৎ হাতে গোণা এ কয়েকটি দিনে তোমরা যদি অসুস্থ হয়ে পড় বা সফর আসে তাহলে এদিনগুলোতে রোজা রাখার বিষয়ে ছাড় রয়েছে। কিন্তু ছুটে যাওয়া রোযার এই সংখ্যা বছরের যে কোন সময় পূর্ণ করতে হবে। কোন অজুহাত নয়, বরং যারা চিররোগী অর্থাৎ যদি ডাক্তার বলে থাকে যে, রোযা রাখবেনা, তাহলে যদি সামর্থ্য থাকে একজন মিসকীনকে রোযা রাখাও। সামর্থ্য থাকলে এটি করা আবশ্যক। অবশ্য কেউ যদি আর্থিক দিক থেকে এতটা অসচ্ছল হয়ে থাকে যে, তার নিজেরই জীবন অতিবাহিত হয় সদকা এবং অন্যের সাহায্যের মাধ্যমে, তাহলে ভিন্ন কথা। বাকি সবার জন্য নিজে যা খায় অনুরূপ খোরাক সরবরাহ করে একজন মিসকীনকে রোযা রাখানো আবশ্যক। হ্যাঁ যদি এর বেশি সামর্থ্য থাকে তাহলে ফিদিয়াও দিয়ে দাও, আর একইসাথে রোযাও রাখ।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতীত ভার দেন না। তিনি বলেন, সাধ্য অনুসারে যতটা সামর্থ্য আছে, নিজে যা পানাহার কর সে অনুযায়ী অতীতের জন্য ফিদিয়া দিয়ে দাও আর ভবিষ্যতের জন্য অঙ্গীকার কর যে, অবশ্যই সব রোযা রাখব। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৫০)

তিনি পুনরায় বলেন, 'একবার আমার মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, ফিদিয়া নির্ধারণের কারণ কী? তখন ভাবলাম অর্থাৎ আমার সামনে স্পষ্ট হলো যে, সামর্থ্য লাভের জন্য। অর্থাৎ ফিদিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে যেন আল্লাহ তা'লা রোযা রাখার সামর্থ্য দান করেন। যেন সে রোযা রাখার সামর্থ্য পায়। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'লা সর্বশক্তিমান। তিনি চাইলে একজন যক্ষারোগীকেও রোযা রাখার শক্তি দান করতে পারেন। তাকেও সুস্থ করে আল্লাহ্ তা'লা রোযা রাখার শক্তি দিতে পারেন। তিনি বলেন, ফিদিয়ার উদ্দেশ্য হলো সেই শক্তি অর্জিত হওয়া আর এটি খোদার কৃপাতেই হয়। তিনি বলেন, আমার মতে খুব ভালো হয় যদি মানুষ দোয়া করে যে, হে আমার প্রভু! এটি তোমার একটি আশিসময় মাস আর আমি এটি থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি। জানি না আগামী বছর জীবিত থাকব কিনা, আর এই ছুটে যাওয়া রোযাগুলো রাখতে পারব কিনা। অর্থাৎ স্বাস্থ্য অনুমতি দিবে কিনা (তা জানি না)। তিনি বলেন, এই কথাগুলো নিবেদন করে আল্লাহর কাছে মানুষের সামর্থ্য যাচনা করা উচিত। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৫৮)

অতএব সাময়িকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিও ফিদিয়া দিতে পারে। আর সফরের সমাপ্তিতে রোযা রাখাও তার জন্য আবশ্যক। এই উভয় বিষয় এটি থেকে প্রমাণিত হয়। যারা সুস্থতা লাভের পর রোযা রাখতে সক্ষম তাদের জন্য শুধু ফিদিয়া দেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করা অবৈধকে বৈধকরণের দ্বার উন্মোচনের নামান্তর। অর্থাৎ স্বাস্থ্য ভালো নয়, রমজানের পর সুস্থতা ফিরে পায় এমন ব্যক্তি যদি বলে বসে যে, আমরা রমজানের ফিদিয়া দিয়েছি- এটি তো অবৈধ বৈধকরণ বৈকি? অযৌক্তিক ছাড় বা অনুমতির পথ খুলে দেওয়া এবং বিদাতের সূচনা করা। ফিদিয়া আদায় করে দিলেও রমজানের পর রোযা আবশ্যকক। অবশ্য চিররোগী, দুগ্ধবতী মা, অন্তসত্তা মহিলাদের এই অবস্থায় যদি বছর কেটে যায় তাহলে তাদের জন্য ফিদিয়াই যথেষ্ট। কিন্তু ফিদিয়ার পাশাপাশি এই মাসে ইবাদত, যিকরে ইলাহী এবং অন্যান্য পুণ্যকর্ম অব্যাহত রাখা আবশ্যক। এমন নয় যে, আমরা ফিদিয়া দিয়ে সকল দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম। অতএব রোযা না রাখলেও এরাও রমজানের কল্যাণ লাভ করবে যদি ফিদিয়া দিয়ে দেয় এবং অন্যান্য পুণ্যকর্ম অব্যাহত রাখে। ফিদিয়া দিয়ে নামায ভুলে যাওয়া এবং অন্যান্য নেক কর্ম ভুলে যাওয়া মু'মিন বানায় না, প্রকৃত মু'মিন বানায় না। রমজানের কল্যাণরাজির অংশীদার করে না।

পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে বলেন যে, যে পুণ্যকর্মই তোমরা পূর্ণ আনুগত্যের সাথে কর, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহর নির্দেশ মনে করে কর, আল্লাহ্ তা'লা এর ভালো ফলাফল সৃষ্টি করবেন। কারো কারো মতে **'মান তাতাওওয়া খায়রান'** এর অর্থ হলো কোন কাজ নফল ইবাদত মনে করেও যদি কর তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এই আয়াতের উভয় অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ ঐচ্ছিকভাবে অতিরিক্ত ফিদিয়া প্রদান করে বা একের পরিবর্তে দুজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ায় বা আজকে কোন কারণে রোযা রাখতে পারি নি আগামীকাল রাখব এটি নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও যদি ফিদিয়া দিয়ে দেয় তাহলে এটি অতিরিক্ত নেকী বা ঐচ্ছিক নেকী। আল্লাহ্ তা'লা

বলেন যে, এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কেননা আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যকর্মের প্রতিদান দিয়ে থাকেন, সেই পুণ্য কষ্ট করে করা হোক বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নফল হিসেবে করা হোক না কেন। আল্লাহ্ তা'লা এর উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন। এই আয়াতের শেষে আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় বলেন, তোমাদের রোযা রাখা তোমাদের জন্য সকল অর্থে উত্তম।

এর পরের আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এ মাসেই আমরা পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা তোমাদের জন্য হেদায়েত লাভের কারণ আর স্পষ্টও উজ্জ্বল প্রমাণাদি ও নিদর্শনে সমৃদ্ধ।

অতএব রমযান মাসের সাথে কুরআনের এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এ মাসেই রোযা রাখার পাশাপাশি কুরআন তিলাওয়াত করা, কুরআনে প্রণিধান করা, এর আদেশ-নিষেধ খুঁজে বের করে তার ওপর আমল করার চেষ্টা করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লার আদেশ নিষেধ মেনে আমরা রমযানের রোযা প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারি। প্রত্যেক ব্যক্তি কুরআনের অর্থের গভীরে পৌঁছতে পারে না তাই পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও অনুবাদ পাঠের পাশাপাশি, যা সে নিজেই পড়তে পারে জামা'তের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মসজিদে যেখানে যেখানে দরসের ব্যবস্থা আছে, তা থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এছাড়া এম,টি,এ-তে নিয়মিত দরসের ব্যবস্থা আছে-তা থেকেও লাভবান হওয়া আবশ্যক। এম,টি,এ-তে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর দরস সম্প্রচারিত হচ্ছে। মহানবী (সা.)-এরও নির্দেশ এটিই যে,এ মাসে অধিক হারে কুরআন করিম তিলাওয়াত কর। বছরের অন্য সময়েও এক আহমদীর কুরআন পাঠের দিকে অনেক বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত কিন্তু রমযানে বিশেষভাবেএর ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অন্যথায় কেবল রোযা রাখা অর্থহীন। বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'লা এ মাসে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। আর মহানবী (সা.) বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন। আমরা সৌভাগ্যবান কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ যুগে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসকে মান্য করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। যিনি আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের নিগূঢ় তত্ত্ব ও গভীর মর্ম আর তফসির এবং অর্থের নতুন নতুন দিক সম্পর্কে অবহিত করেছেন সেখানে এর উপর আমল করা এবং কুরআনে করিমকে সম্মান করা এবং তা তিলাওয়াত এবং এতে প্রণিধান করার দিকেও বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন আর বলেছেন,এর তিলাওয়াত এবং এর ওপর আমলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত আর আমাদের নিজেদের অবস্থার মাঝে কী ধরনের পরিবর্তন সাধন করতে হবে তাও অবহিত করেছেন।

হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন: বাহ্যিক জ্ঞান এবং কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মাঝে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। জাগতিক যে জ্ঞান আর কুরআনের জ্ঞান -উভয়ের মাঝে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। জাগতিক ও গতানুগতিক জ্ঞানঅর্জন তাকওয়ার সাথে শর্তসাপেক্ষ নয়। আরবী ব্যাকরণ, চিকিৎসা শাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি পড়ার জন্য তাকওয়া আবশ্যক নয়। 'যেমন আরবী ব্যকরণ পড়ে নিলাম, পদার্থবিদ্যা পড়লাম, জ্যোতির্বিদ্যা পড়লাম, বা চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি পড়ার জন্য তাকওয়া থাকা আবশ্যক নয় অথবা তার নামায রোযায় নিয়মানুবর্তী হওয়া আবশ্যক নয়। এ কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, কুরআন বোঝার জন্য নিয়মিত নামায, রোযা ও ইবাদত করা আবশ্যক। তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করাও আবশ্যক। তিনি (আ.) বলেন, ঐ ক্ষেত্রে নিয়মিত নামায পড়া বা রোযা রাখা আবশ্যক নয়, ঐশী আদেশ ও নিষেধকে সর্বদা দৃষ্টিতে রাখাও আবশ্যক নয়। তথা আল্লাহ্ তা'লা যা করার আদেশ দিয়েছেন এবং যেগুলো করতে আল্লাহ্ তা'লা বারণ করেছেন তা সর্বদা দৃষ্টিতে রাখা। অর্থাৎ এটি সাধারণ মানুষের জন্য আবশ্যক নয় কিন্তু কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার জন্য এগুলো আবশ্যক। সার কথা হলো জাগতিক জ্ঞান অর্জনের জন্য (তাকোয়া) আবশ্যক নয় কিন্তু কুরআন পাঠ বা কুরআনের করিমের জ্ঞান লাভের জন্য আল্লাহ্র সকল আদেশ এবং নিষেধকে মানুষের জন্য সামনে রাখা আবশ্যক। তিনি (আ.) বলেন, নিজেদের সকল কথা এবং কর্ম আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর অধিনস্ত রাখা উচিত। বরং অনেক সময় দেখা গেছে, জাগতিক জ্ঞানের বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং জাগতিক জ্ঞান অন্বেষী নাস্তিকতার শিকার হয়ে সকল প্রকার পাপাচারে লিপ্ত থাকে। অধুনাকালে পৃথিবীর সামনে একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। যদিও ইউরোপ আমেরিকা জাগতিক জ্ঞানে অনেক উন্নতি করছে আর নিত্যদিন নিত্য নতুন আবিষ্কারাদি করে থাকে কিন্তু তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত লজ্জাস্কর। আর আজকে তো আমরা দেখছি যে, স্বাধীনতার নামে নৈতিকতার ক্ষেত্রে সে যুগের চেয়ে অনেক বেশি অধঃপতনের শিকার হচ্ছে। তিনি বলেন, লন্ডনের পার্ক আর প্যারিসের হোটেলের বৃত্তান্ত যা ছেপেছে তা উল্লেখ করতেও আমাদের রুচিতে বাধে। কিন্তু স্বর্গীয় জ্ঞান এবং কুরআনী নিগূঢ় তত্ত্ব জানার জন্য তাকওয়া হলো প্রথম শর্ত। এ ক্ষেত্রে 'তওবাতুন নসূ' অর্থাৎ খাঁটি তওবা করার প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ সত্যিকার তওবার প্রয়োজন রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পুরো বিনয় ও নম্রতার সাথে খোদার নির্দেশাবলী শিরোধার্য না করবে, আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত না হবে আর তাঁর প্রতাপ ও তাঁর ভয়ে ভীতবিহ্বল হয়ে বিনয়ের সাথে প্রত্যাবর্তন না করবে, কুরআনের জ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হতে পারে না। আর আত্মার এসব গুণাবলী এবং বৃত্তির প্রতিপালন কুরআন থেকে সে পেতে পারে না যা লাভের ফলে আত্মায় এক প্রকার আনন্দ ও প্রশান্তি লাভ হয়। অতএব কুরআনী জ্ঞান লাভ করার জন্য তাকওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি আরো বলেন, কুরআন শরীফ আল্লাহ্ তা'লার গ্রন্থ, এর জ্ঞানের চাবিকাঠি আল্লাহ্র হাতে। অতএব তাকওয়া এর জন্য সিড়ি স্বরূপ। তাকওয়ার সিড়ি ব্যবহার করলেই কুরআনী জ্ঞানে বুৎপত্তি লাভ হবে। তাই এটি কিভাবে হতে পারে যে, বেঈমান, দুস্কৃতকারী, নোংরা প্রকৃতির মানুষ, জাগতিক কামনা বাসনার পূজারী তা থেকে লাভবান হবে? তাই এক মুসলমান মুসলমান আখ্যায়িত হয়ে, হোক না সে আরবী ব্যাকরণ, রূপক ও অলংকার শাস্ত্রের যত বড় বিশেষজ্ঞই হোক না কেন, জগতের লোকদের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় শায়খুল কুল সেজেও যদি বসে অর্থাৎ সব জ্ঞান রাখে, আরবী ব্যাকরণও জানে, আরবীর জ্ঞানও খুব রাখে, কুরআনের খুব ভালো অর্থও করতে পারে, কিন্তু যদি আত্মশুদ্ধি না করে তাহলে কুরআনের জ্ঞান থেকে তাকে অংশ দেওয়া হয় না। তিনি বলেন, আমি দেখছি যে, এখন পৃথিবীর মনোযোগ অনেক বেশি জাগতিক জ্ঞানের প্রতি নিবদ্ধ। পাশ্চাত্যের ভাবধারা তাদের নতুন আবিষ্কারাদি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সারা বিশ্বকে হতচকিত করে রেখেছে। মুসলমানরাও যদি নিজেদের মঙ্গল ও সাফল্যের পথ নিয়ে চিন্তা করে তাহলে দুর্ভাগ্যবশত পাশ্চাত্যবাসীদের নিজেদের ইমাম বানানোর কথাই চিন্তাই করেছে। জাগতিকতার মোহে আচ্ছন্ন হয়েছে। আর বৈষয়িক এই উন্নতি অর্থাৎ জাগতিক উন্নতিকেই সবকিছু ভেবে বসেছে। তিনি বলেন, এ তো নব্য আলোকিত চিন্তাধারার লোকদের অবস্থা যারা পুরোনো ফ্যাশনের মুসলমান আখ্যায়িত হয় আর নিজেদেরকে ইসলাম ধর্মের সুরক্ষাকারী মনে করে তাদের সারা জীবনের প্রাপ্তির সার ও নির্যাস কেবল এতটুকু যে, তারা আরবী ব্যাকরণের বাগবিতণ্ডায় লিপ্ত এবং 'যোয়াল্লিন' শব্দের উচ্চারণ নিয়ে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত। এই বিষয়ে বিতণ্ডায় লিপ্ত যে, ব্যকরণ কী, 'সারাফ' কী এবং 'নাহাব' কাকে বলে, সঠিক উচ্চারণ কীভাবে করতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, কুরআন শরীফের প্রতি আদৌ মনোযোগ নেই। আর হবেই বা কিভাবে, কেননা আত্মশুদ্ধির প্রতি যে তারা মনোযোগী নয়। সুতরাং তিনি বলেন, আহমদীদের এ কথা সম্পর্কে ভাবা উচিত যে, কেবল জাগতিকতার পেছনে ছুটবে না বরং কুরআনের জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা কর। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪২৫-৪২৭)

পুনরায় এক সাহেব একবার তাঁকে প্রশ্ন করে যে, কুরআন শরীফ কিভাবে পড়া উচিত। তিনি (আ.) বলেন:পবিত্র কুরআন গভীর অভিনিবেশ, মনোযোগ ও মনোনিবেশসহকারে পাঠ করা আবশ্যক। হাদীস শরীফে রয়েছে **'রুব্বা কারিন ইয়ালআনুহু'**- অর্থাৎ কুরআনের এমন অনেক পাঠকারী দেখা যায় যাদেরকে কুরআন অভিসম্পাত করে। যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে কিন্তু তদনুযায়ী কর্ম করে না, তাকে কুরআন অভিশাপ দেয়। কুরআন তিলাওয়াতের সময় যখন কুরআনের রহমতের আয়াত আসে তখন যেন খোদা তা'লার রহমত যাচনা করা হয় আর যেখানে কুরআনে কোন জাতির শাস্তির বিষয় উল্লেখ করা হয় সেখানে খোদা তা'লার শাস্তি থেকে রক্ষা লাভের জন্য তাঁর আশ্রয় প্রার্থণা করা অর্থাৎ তৌবা ও এস্তেগফার করা উচিত এবং গভীর অভিনিবেশসহকারে কুরআন পাঠ করা উচিত অর্থাৎ আর তদনুযায়ী আমল করা আবশ্যক।

(মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯৯-২০০)

অতএব এই হলো কুরআন পাঠের সঠিক পদ্ধতি। এ দিনগুলোতে যেহেতু কুরআন পাঠের দিকে আমাদের বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে, তাই আমাদের এরূপ অভিনিবেশসহকারে ও চিন্তাভাবনার সাথে কুরআন পাঠ করা উচিত। হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) আরও বলেন:

"তোমরা সাবধান থাক এবং আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা এবং কুরআনের আদেশাবলীর বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপও নিবে না। আমি তোমাদেরকে সত্য সত্য বলছি, যে ব্যক্তি কুরআনের সাতশত আদেশাবলীর একটি ছোট আদেশকেও অবজ্ঞা করে, সে নিজ হাতে নিজের মুক্তির পথ রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ মুক্তির পথ পবিত্র কুরআনই উম্মোচন করেছে এবং বাকি সবকিছু এর ছায়া বিশেষ। তাই তোমরা কুরআন অভিনিবেশসহকারে পাঠ করো এবং কুরআনের সাথে গভীর প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হও, এমন প্রেমবন্ধন যা তোমরা অন্য কারো সাথে স্থাপন করনি। কেননা খোদা তা'লা যেভাবে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "আল খায়রু কুল্লুহু ফিল কুরআন" তথা সকল প্রকারের কল্যাণ কুরআনের মাঝেই নিহিত এ কথাই ধ্রুবসত্য। তাদের জন্য পরিতাপ যারা অন্য কিছুকে কুরআনের উপর প্রাধান্য দেয়। তোমাদের সকল উন্নতি ও মুক্তির উৎস হল কুরআনে। তোমাদের ধর্মীয় এমন কোন প্রয়োজন নেই যা কুরআন পূর্ণ করে না। কুরআন কেয়ামতের দিন তোমাদের ঈমানের সত্যায়নকারী বা ঈমানকে মিথ্য প্রমাণকারী হবে কুরআন। তাই কুরআন ভিন্ন আকাশের নিচে অন্য কোন (ঐশী) গ্রন্থ নেই যা কুরআনের মাধ্যম ব্যতিরেকে তোমাদের পথ প্রদর্শন করতে পারে। কুরআনের মাধ্যমে যদি পথ চল তাহলে কুরআন তোমাদের হিদায়াত দেবে। খোদা তা'লা তোমাদের প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, কুরআনের ন্যায় এক মহান কিতাব তোমাদেরকে দান করেছেন। আমি তোমাদেরকে সত্য সত্য বলছি, এই কিতাব যা তোমাদের প্রতি পাঠ করা হয়েছে, তা যদি খ্রিষ্টানদের প্রতি অবতীর্ণ হতো তাহলে তারা ধ্বংস হতো না। এই নেয়ামত ও হেদায়াত যা তোমাদেরকে দান করা হয়েছে, ইহুদীদেরকে তওরাতের বদলে যদি দেওয়া হতো তাহলে তাদের কতক দল কেয়ামতের অস্বীকারকারী হতো না। তাই তোমাদেরকে যে নেয়ামত দান করা হয়েছে সেই নেয়ামতের সঠিক মূল্যায়ন করো। এ অতি প্রিয় এক নেয়ামত, এটি অনেক বড় এক সম্পদ। যদি কুরআন না আসতো তাহলে পুরো জগত ছিল এক নোংরা মাংসপিণ্ডের ন্যায়। পবিত্র কুরআন হলো সেই কিতাব যার বিপরীতে অন্য সকল হেদায়াত তুচ্ছ।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ২৬-২৭)

অতএব কুরআন পাঠ করা, এটি বুঝা এর পথনির্দেশনা ও তদনুযায়ী আমল করার দিকে আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। রমযানে অনেকের এ দিকে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েই থাকে। এটিকে জীবনের স্থায়ী অংশ বানিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা বিশেষভাবে রমযান মাসে কুরআন পাঠের দিকে মোমেনদের যে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন এর কারণ, এই সংগ্রাম-সাধনার মাস অতিবাহিত করতে গিয়ে যদি আমরা কুরআন পাঠের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিই তাহলে সাধারণ দিনগুলোতেও এ দিকে মনোযোগী হবার অভ্যাস গড়ে উঠবে। অন্যথায় রমযান মাসে আল্লাহ্ তা'লার কুরআনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের যে উদ্দেশ্য, তা-ই ব্যহত হয়। মো'মেন সে যে অবিচলতার সাথে পুণ্যের অন্বেষণ করে এবং তা জারি রাখে। অতএব এই মহান গ্রন্থ মহানবী (সা.) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এটিকে আমাদের হেদায়াতের কারণ বানানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করা আবশ্যক।

এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতে আরও স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, নিয়মিত রোযা রাখতে হবে আর অসুস্থ বা সফরে যারা থাকবে তাদেরকে পরিত্যাক্ত রোযা পরবর্তীতে পূর্ণ করতে হবে। এটি এক আবশ্যকীয় বিষয়। কেবল ফিদিয়া দিলেই তোমাদের মুক্তি মিলবে না। সফর এবং অসুস্থাবস্থায় রোযা না রাখার ছাড় দিয়ে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি এক অনুগ্রহ করেছেন। কেননা আল্লাহ্ তা'লা নিজ বান্দাদের ওপর কষ্ট চাপান না। এরপর তিনি বলেন, রোযার দিনগুলো বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'লার মহিমা কীর্তন ও যিকরে এলাহী এবং ইবাদতবন্দেগিতে অতিবাহিত কর। আর এ বিষয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য হেদায়েতের এমন সুমহান গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন যা পরিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ হেদায়েত। প্রকৃত কৃতজ্ঞতা তখনই প্রকাশ সম্ভব যদি আমরা তাকে কর্মে রূপায়ন করি। এরপর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার বান্দা, আমার অন্বেষী, আমার সন্ধানে বিশেষভাবে প্রশ্ন করে। রমযান মাসে এই অন্বেষণে আরো এগিয়ে যায়; (এর উত্তর হলো)আমি নিকটে আছি, আমি তাদের ডাক শুনছি। বিশুদ্ধচিত্তে আমার কাছে যাচনা করলে আমি প্রার্থনা গ্রহণও করি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন দোয়া কবুল করানোর জন্য আবশ্যক হলো, প্রার্থনাকারীও যেন আমার কথা মান্য করে, আমার নির্দেশ শিরোধার্য করে, আমার প্রতি ঈমানকে যেন সুদৃঢ় করে। এই যে অভিযোগ , আমরা তো দোয়া করি, আমরা অনেক দোয়া করেছি কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন নি। কতিপয় মানুষের পক্ষ থেকে কিছুদিন পরই এই অভিযোগ আরম্ভ হয়ে যায়। আমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশনা না মানি, তাতে আমল না করি, আল্লাহ্ তা'লার কাছে তার ভালোবাসা যাচনা না করি, তার প্রকৃত বান্দা না হই, শুধু বিপদের সময় আসি বা কোন সমস্যার সময়ই তাকে ডাকি এবং এরপর ভুলে যাই, তাহলে এই অভিযোগ করার কী অধিকার আছে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া গ্রহণ করেন নি? সুতরাং সর্বপ্রথম আমাদের নিজেদেরকে শুধরাতে হবে। হ্যাঁ নিজেদের সংশোধন করার জন্য চেষ্টা করার পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা আকর্ষণের জন্য দোয়ার প্রয়োজন হয় তাই দোয়াও করতে হবে। এরপর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রশান্তি ও স্বস্তির উপকরণও সৃষ্টি করবেন। দোয়া কীভাবে গ্রহণ করেন, যদি হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে ও স্বস্তি লাভ করে তাহলে এটিও দোয়া গৃহীত হওয়া। অধিকন্তু আপন নিষ্ঠাবান বান্দা এবং নিজ প্রেমিকদের দোয়া কবুল করার ন্যায় আমাদের দোয়াও আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণকরবেন। অতএব, রমযান মাসে প্রথম প্রচেষ্টা যদি আমাদের পক্ষ থেকে হয় তাহলেমোমেনদের স্বীয় নৈকট্য দান এবং দোয়া গ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থাও আল্লাহ্ তা'লা করে দেন। সুতরাং আমাদের বিশেষ চেষ্টা-সাধনা করা প্রয়োজন,অন্যথায় আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার আমাদের কোন অধিকার নেই যে, তিনি দোয়া গ্রহণ করেন না। দোয়ার পদ্ধতি এবং নিজের অবস্থাকে দোয়া গৃহীত হবার পর্যায়ে উপনীত করার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কীভাবে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন- তিনি বলেন, একথা সত্য, যে ব্যক্তি আমল করে না সে দোয়া করে না বরং খোদা তা'লার পরীক্ষা নেয়। তাই, দোয়া করার পূর্বে নিজের সকল শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করা অবধারিত আর এটিই দোয়ার মর্ম বা অর্থ।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২৪)

এরপর তিনি বলেন, এ কথা মনে করো না, আমরাও প্রতিদিন দোয়া করি এবং সব নামায যা আমরা পড়ি সেগুলো দোয়াই তো। নিঃসন্দেহে নামায দোয়াই কিন্তু সেই বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতিও সৃষ্টি হওয়া উচিত, দোয়ার যে প্রকৃত উদ্দেশ্য সেটিও অর্জিত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, কেননা, সেই দোয়া যা তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর এবং অনুগ্রহের ফলে মন থেকে উদ্ভূত হয় এর অবস্থা ও প্রকৃতিই ভিন্ন। সেটি বিলোপকারী বিষয়। এটা ভস্মিভূতকারী অগ্নি, রহমতকে আকর্ষণকারী এক চুম্বকীয় আকর্ষণ। এটা মৃত্যু, কিন্তু অবশেষে জীবন দান করে। এটা এক প্রবল বন্যা কিন্তু অবশেষে নৌকা হয়ে যায় অর্থাৎ তা সমুদ্রের তুফান কিন্তু সেই তুফান নৌকা হয়ে যায়, রক্ষাকবচ হয়ে যায়। তিনি বলেন, সকলবিশৃঙ্খল অবস্থা সুশৃঙ্খল হয়ে যায়। সব বিষ এক পর্যায়ে এরদ্বারা প্রতিষেধক হয়ে যায়। অতএব, প্রকৃত দোয়া এভাবে নিজের কার্যকারিতা প্রকাশ করে।

তিনি বলেন, সৌভাগ্যবান সেসব বন্দী যারা দোয়া করে ক্লান্ত হয় না, কেননা একদিন তারা মুক্তি পাবে। কল্যাণমণ্ডিত সেসব অন্ধ যারা দোয়াতে আলস্য দেখায় না, কেননা একদিন তারা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। কল্যাণমণ্ডিত তারা যারা কবরে পতিত অবস্থায় দোয়ার মাধ্যমে খোদার সাহায্য চায়, কেননা একদিন তারা কবর থেকে বেরিয়ে আসবে। অর্থাৎ তারা যারা আধ্যাত্মিকভাবে মৃত। তোমরা কল্যাণমণ্ডিত, যদি তোমরা দোয়ার ব্যাপারে কখনও ক্লান্তি প্রকাশ কর না আর তোমাদের আত্মা দোয়ার জন্য বিগলিত হয় ও তোমাদের চোখ অশ্রু বিসর্জন করে, তোমাদের বক্ষে এক প্রকারের আগুন লাগিয়ে দেয় এবং নির্জনতার স্বাদ উপভোগের জন্য তোমাদেরকে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এবং জনমানবশূন্য জঙ্গলে নিয়ে যায় এবং তোমাদেরকে ব্যাকুল ও পাগলপারা এবং আত্মবিস্মৃত করে তোলে কেননা অবশেষে তোমাদের প্রতি কৃপা করা হবে। সেই খোদা যার প্রতি আমরা আহ্বান করছি তিনি পরম কৃপালু ও দয়ালু, লজ্জাশীল, সত্যবাদী,

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নিজ সন্তানদেরকেও সম্মান দেওয়ার রীতি অবলম্বন কর এবং তাদেরকে সর্বোত্তম পন্থায় প্রশিক্ষিত করার চেষ্টা কর।

(ইবনে মাজা, কিতাবুল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Amir Murshidabad District

বিশ্বস্ত ও অসহায়দের প্রতি দয়ার্দ্র। অতএব তোমরাও বিশ্বস্ত হয়ে যাও। পুরো আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে দোয়া কর। ফলে তিনিও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। এ পৃথিবীর হট্টগোল থেকে পৃথক হয়ে যাও, নিজের পক্ষপাতদুষ্ট চিন্তাধারাকে ধর্মের নাম দিও না। তিনি বলেন, দোয়াকারীদের খোদা নিদর্শন দেখাবেন এবং যাচনাকারীদেরকে এক অলৌকিক নেয়ামত দান করা হবে। দোয়া খোদার পক্ষ থেকে আসে আর খোদার দিকেই ফিরে যায়। দোয়ার ফলে খোদা এতটা নিকটে এসে যান যেমনটি তোমাদের প্রাণ তোমাদের কাছে আছে। দোয়ার প্রথম পুস্কারস্বরূপ মানুষের ভিতর পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি বলেন, মোটকথা দোয়া সেই মহৌষধ যা এক মুষ্ঠি ধূলোকে পরশমনি বানিয়ে দেয় এবং এটি এক প্রকার পানি যা অভ্যন্তরীণ নোংরামিকে বিধৌত করে। সেই দোয়ার মাধ্যমে আত্মা বিগলিত হয় এবং পানির মত প্রবাহিত হয়ে আল্লাহর আস্তানায় পতিত হয়। এটি খোদার সমীপে দণ্ডায়মান হয় এবং রুকু ও সিজদাও করে। এরই প্রতিচ্ছবি সেই নামায যা ইসলাম শিখিয়েছে। রূহের দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ হলো, তা খোদার সন্তুষ্টির জন্য সকল সমস্যা সহ্য করা এবং নির্দেশ মানার বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ততা প্রকাশ করে। এর রুকু করা বা ঝুঁকার অর্থ হলো, তা সকল ভালোবাসা এবং সম্পর্ককে ছিন্ন করে খোদার পানে বিনত হয় এবং খোদার হয়ে যায়। আর আত্মার সিজদা করা হলো, তা খোদার আস্তানায় পতিত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলীন করে দেয়, নিজ সত্তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় অর্থাৎ আপনঅস্তিত্বের ছাপকে মিটিয়ে দেয়। এটিই সত্যিকারের নামায যা খোদার সাথে মিলিত করে আর ইসলামী শরীয়ত এর চিত্র প্রাত্যহিক নামাযে অঙকন করে দেখিয়েছে যেন সেই দৈহিক নামায আধ্যাত্মিক নামাযে পর্যবসিত হয় বা আধ্যাত্মিক নামাযে নিয়ে যাওয়ার কারণ হয়। ”

(লেকচার সিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২২২-২২৪)

অতএব, এটি সেই অবস্থা যা আমাদের নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে যেন দোয়া গৃহীত হবার দৃশ্য আমরা অবলোকন করি। রমযানের রোযার পাশাপাশি ইবাদতের প্রকৃত তত্ত্ব ও মর্মও যেন আমরা বুঝি আর দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃশ্যও যেন আমরা দেখি। যদি দোয়া কবুলিয়তে কোথাও ঘাটতি থাকে তাহলে মূলত আমাদের মাঝেই ত্রুটি রয়েছে। খোদা তা'লার কথা কখনো ভুল হতে পারে না। নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য এ দিনগুলোতে বিশেষভাবে আমাদের দোয়া করা উচিত। আল্লাহ তা'লা যিনি প্রথম থেকেই নিজ বান্দাদের অতি নিকটে রয়েছেন তাই এ দিনগুলোতে আরো নিকটে চলে এসেছেন। নিজেদের ফরজ ইবাদতসমূহ এবং নিজেদের নফল ইবাদতসমূহে পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'লার সমীপে ঝুঁকা উচিত। মহানবী (সা.) আমাদেরকে বলেছেন, এই মাসের প্রথম দশদিন রহমত, মধ্যবর্তী দশদিন মাগফেরাতের কারণ এবং শেষ দশদিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি দানকারী। (কুনযুল আমাল, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪৭৭, হাদীস ২৩৭১৪)

আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে তাঁর প্রকৃত বান্দা বানিয়ে স্বীয় রহমত ও মাগফেরাতের চাদরে আবৃত করে নিন এবং এই মাস হতে আমরা যেন কল্যাণ লাভকারী হই। এদিনগুলোতে বিশেষভাবে জামাতের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ তা'লা যেন আহমদীয়তের শত্রুদের সৃষ্ট অনিষ্টে তাদেরই ক্লিষ্ট করেন এবং যেখানে যেখানে জামাতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে আল্লাহ তা'লা যেন সেখানে তাদের ষড়যন্ত্র এবং তাদের পরিকল্পনা তাদেরই মুখে ছুঁড়ে মারেন। (দোয়া করুন) যুগ ইমামকে যেন তারা গ্রহণ করতে পারে । বিশ্বের সার্বিক অবস্থার জন্যও দোয়া করুন, খুব দ্রুত এটি অনেক বড় ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আল্লাহ তা'লা বিশ্ববাসীকে সুমতি দিন, এরা যেন খোদা তা'লাকে চিনতে পারে আর যেন এই ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়।

নামাযের পর আমি দু'ব্যক্তির গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব। তাদের মৃত্যুর ঘটনা দুই মাস পূর্বের কিন্তু তথ্য এখন আমার সামনে এসেছে। প্রথম নাম হলো ডাক্তার তাহের আজিজ আহমদ সাহেব, পিতা ইসলামাবাদের মরহুম ইরশাদুল্লাহ ভাট্টি সাহেব। আর দ্বিতীয় হল ডাক্তার ইফতেখার আহমদ সাহেব, পিতা আমেরিকার মরহুম ডাক্তার খাজা নাজির আহমদ সাহেব। এই দুইজন 'ফতে জাঙ্গ' এর নিকটবর্তী নিজেদের জমিনের বিষয়াদী দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে ডাক্তার ইফতেখার আহমদ সাহেবের এক কর্মচারী ১৩ মার্চ অপহরণ করার পর উভয়কে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। সেখানে হত্যাকারীদের এই চিন্তা হয় না যে, আহমদীদের হত্যা করলে আমরা ধৃত হব। কেননা, আহমদীদেরকে হত্যা করা তাদের দৃষ্টিতে পুণ্যও আর মৌলভীদের আশীর্বাদ হলো তাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে, বরং পুরো চেষ্টা করবে। এই প্রেক্ষিতে কোন না কোনভাবে আহমদীয়াতের বিষয়টিও এতে জড়িত। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি তারা শহীদ।

ডাক্তার তাহের আজীজ আহমদ সাহেব ১৯৬৭ সনের ২৭ নভেম্বর মিঠা টওয়ানায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় গুরুদাসপুরের লুধী নাঙ্গাল নিবাসী তার বড় দাদা হযরত মৌলভী নূর আহমদ সাহেবের মাধ্যমে। হযরত মৌলভী নূর আহমদ সাহেব (রা.) মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীর সেই কুফরী ফতয়োয় স্বাক্ষর দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন যা সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বিরুদ্ধে প্রস্তত করেছিলেন আর এ বিষয়ে তিনি মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীকে পত্র লিখেছিলেন, যা আলহাকাম পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ১০ অক্টোবর ১৮৯৭ সনে প্রকাশ করা হয়।

(আল হাকাম, ৮ই অক্টোবর, ১৮৯৭, পৃ: ৫-৬)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সন্তান মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব এবং মির্যা ফযল আহমদ সাহেব এর শিক্ষার জন্য হযরত মৌলভী নূর আহমদ সাহেবের পিতা মৌলভী আল্লাদাত্তা ভাট্টি লুধী নাঙ্গাল সাহেবকে কাদিয়ানে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, যার উল্লেখ তারিখে আহমদীয়াতের ১ম খণ্ডে রয়েছে। (তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৯)

মরহুম মেট্রিকের পর ইসলামাদ হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ থেকে ডিএইচএমএস পাশ করেন, এরপর চাট্টা বুখতাবান ইসলামাবাদে প্র্যাক্টিস শুরু করেন। সর্বজনপ্রিয় ডাক্তার ছিলেন, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, বিনয়ী সহানুভূতিশীল ও ভদ্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। দীর্ঘকাল ডাক্তার সাহেবের ঘর নামায সেন্টার হিসেবেও ব্যবহার হতে থাকে। খেলাফতের সাথেও তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ভালোবাসাপূর্ণ। তাঁর মৃত্যুতে শত শত অআহমদী পুরুষ মহিলা শোক প্রকাশ করে আর তার মৃত্যুকে, কাল মৃত্যুকে জাতীয় ক্ষতি বলেও উল্লেখ করেন। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে মরহুম তার স্ত্রী ছাড়াও দুজন কন্যা এবং একজন পুত্র রেখে গেছেন। তার পুত্র খালেদ এখানেই অর্থাৎ লন্ডনে থাকেন, তিনি রানা খালেদ সাহেবের জামাতা। মরহুমের বড় ভাই ফুযায়েল আইয়াজ সাহেব যিনি ওয়াকফে জিন্দেগী মুরব্বী, যিনি প্রথমে এম.টি.এ-তে সেবা করছিলেন, বর্তমানে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়াতে আছেন।

দ্বিতীয় মরহুম হলেন ডাক্তার ইফতেখার আহমদ সাহেব। তার সম্পর্ক গুজরানওয়ালার ত্রিগড়ির সাথে। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)এর সাহাবী হযরত মুহাম্মদ জামাল সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন। তার বংশে আহমদীয়াত আসে দ্বিতীয় খেলাফতের যুগে তার দাদা খাজা জালালুদ্দিন সাহেবের মাধ্যমে। তার পিতা খাজা নজীর আহমদ সাহেবের রাবওয়ার তালিমুল ইসলাম কলেজে রসায়নবিদ্যা পাড়ানোর সুযোগ পেয়েছেন। মরহুম ডাক্তার সাহেব লাহেরের কিং এ্যাডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস করার পর প্রায় তিন বছর নাইজেরিয়াতে কানুস্ত আহমদীয়া ক্লিনিকে সেবা দানের সুযোগ পেয়েছেন। তিন বছর পর আমেরিকা চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এমডি করেন, তারপর প্রায় ১৫ বছর পাকিস্তানে অবস্থানের পর তিন বছর পূর্বে পুনরায় তিনি আমেরিকায় স্থানান্তরিত হন। সেখানে (অর্থাৎ ক্যালিফোর্নিয়াতে) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেখানেই কাজ শুরু করে দেন। মাঝে সন্তানদের কারণে পাকিস্তানে চলে আসেন। মরহুম গরীবদের লালনকারী ও মানব সেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন আর বিভিন্ন আর্থিক তাহরীকে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন এবং এক নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন।

শোকসন্তপ্ত পরিবারে মরহুমস্ত্রী ছাড়া তিন কন্যা স্মৃতিচিহ্ন রেখেগেছেন। আল্লাহ তা'লা উভয় মরহুমের প্রতি অনুগ্রহ এবং ক্ষমার আচরণ করুন আর এদের সন্তানদেরকেও জামা'ত এবং খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। ****************

যুগ ইমামের বাণী

"এই কৌশলটি সব সময় প্রয়োগ করে দেখ, যখনই কোন বিপদের সম্মুখীন হও, তৎক্ষণাৎ নামাযে দাঁড়িয়ে যাও।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৬)

দোয়া প্রার্থী:

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gouhati)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে অত্যন্ত তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন বয়আতের যাবতীয় শর্ত যথাযোগ্য সম্মানের সহিত পালন করি যাতে সত্য মোমেন হতে পারি। তাঁর নির্দেশ পালন করে আমরা আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করতে পারি, নিজেদের ঈমানকে সমৃদ্ধ করতে পারি, খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করতে পারি, কুরআন করীমের প্রকাশিত জ্ঞান ভান্ডার ও সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারি, আঁ হযরত (সা.) এর প্রকৃত মর্যাদ অনুধাবন করতে পারি এবং নিজেদের নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থার সংশোধন করতে পার।

অতএব, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের দায়িত্ব হল সেই পুস্তকগুলি অধ্যয়ন করে সেগুলি সম্পর্কে প্রণিধান করা

আমার জুমার খুতবা মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং বোঝার চেষ্টা করবেন এবং আমার নির্দেশাবলী পালন করার চেষ্টা করবেন। এটি আপনাদের ঈমান এবং খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্ককে দৃঢ় করবে।

আজ ইসলামের পুনর্জীবন এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা কেবল খিলাফত ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমেই সম্ভব। এই কারণে আপনাদের উচিত সব সময় এই ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা আর আপনার ভবিষ্যত প্রজন্ম যেন সব সময় খিলাফতে আহমদীয়ার আশিসময় ছায়ার আশ্রয়ে থাকে।

জামাত আহমদীয়া ঘানার ৩৭ তম জলসা সালানা গত ২৪ ও ২৫ শে নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হল। জলসার দিনগুলিতে বা জামাত তাহাজ্জুদের ব্যবস্থা ছিল। ফজরের নামাযের পর দরসুল কুরআন অনুষ্ঠিত হত। জর্জটাউনের সেকেন্ডারী স্কুল কুইনস কলেজের হলঘরে জলসার আয়োজন হয়েছিল। এবছর কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ছিল ' রসুলুল্লাহ (সা.) মানবজাতির জন্য এক পরিপূর্ণ আদর্শ' জলসা সালানার যথারীতি উদ্বোধন হয় শনিবার লাজনা ইমাউল্লাহর বিশেষ অধিবেশনের মধ্য দিয়ে। জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন সন্ধ্যায় আরম্ভ হয় যেখানে নারী ও পুরুষ মিলে মোট চল্লিশ জন উপস্থিত ছিলেন। এই অধিবেশনে হযরত আমীরুল মোমেনিন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর বিশেষ বার্তা পাঠ করে শোনানো হয়, যেটি ইংরেজিতে ছিল। তৃতীয় ও শেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ২৫ শে নভেম্বর। এই অধিবেশনে আহমদী সদস্যরা ছাড়াও অ-আহমদী সদস্যরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই অধিবেশনে মোট ১৮৬জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। জলসা সালানার শেষ দিনে মাননীয় উমায়ের খান সাহেব 'নবী করীম (সা.) আজকের পৃথিবীর জন্য পরিপূর্ণ আদর্শ' বিষয়ের উপর সমাপ্তি ভাষণ দেন। মুবাল্লিগ ইনচার্জ মকসুদ আহমদ মনসুর সাহেব ' আঁ হযরত (সা.) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃত্ববোধ' বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন। ঘানার ন্যাশনাল সদর আফতাবুদ্দিন নাসের এই অধিবেশনে পুনরায় হুযুর আনোয়ারের বিশেষ বার্তা পাঠ করে শোনান। দোয়ার মাধ্যমে এই অধিবেশনের সমাপ্তি হয়। সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন (আই.)-এর সেই বার্তাটি উপস্থাপন করা হচ্ছে যেটি তিনি এই জলসা উপলক্ষ্যে পাঠিয়েছিলেন।

২৪ ও ২৫ শে নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে ঘানায় অনুষ্ঠিত জলসা সালানা উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বিশেষ বার্তা

জামাত আহমদীয়া ঘানার প্রিয় সদস্যবর্গ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু

আমি একথা জেনে ভীষণ আনন্দিত যে, ২৪ ও ২৫ শে নভেম্বর, ২০১৮ আপনারা নিজেদের বাৎসরিক জলসার আয়োজন করছেন। আমার দোয়া হল, আল্লাহ তা'লা আপনাদের এই জলসাকে সার্বিক সফলতা দান করুন এবং সমস্ত অংশগ্রহণকারী এই বিশেষ ধর্মীয় সভা থেকে অসাধারণ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করুক এবং তাঁর কৃপার উত্তরাধিকারী হোক। আমাদের উপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি আমাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ(আ.) কে মান্য করার তৌফিক দান করেছেন। যাঁর কথা প্রতি পদে আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা, হেদায়াতের উৎস। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে অত্যন্ত তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন বয়আতের যাবতীয় শর্ত যথাযোগ্য সম্মানের সহিত পালন করি যাতে সত্যিকার মোমেন হতে পারি। তাঁর নির্দেশ পালন করে আমরা আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করতে পারি, নিজেদের ঈমানকে সমৃদ্ধ করতে পারি, খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করতে পারি, কুরআন করীমের অপ্রকাশিত জ্ঞান ভান্ডার ও সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারি, আঁ হযরত (সা.) এর প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন করতে পারি এবং নিজেদের নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থার সংশোধন করতে পারি। এটি আমাদের চরম দুর্ভাগ্য হবে যদি এই ভাণ্ডারের উপস্থিতিতেও আমরা এর থেকে উপকৃত না হতে পারি। অতএব, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের দায়িত্ব হল সেই পুস্তকগুলি অধ্যয়ন করে সেগুলি সম্পর্কে প্রণিধান করা যাতে আমরাও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশা অনুসারে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে পারি।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: আমার উপর বার বার এই ওহী হয়েছে إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ (সূরা নহল, আয়াত: ১২৯) এতবার যে, আমি তা গণনা করতে পরি না। খোদা জানেন, হয়তো দুই হাজার বার হবে। এর উদ্দেশ্য এটাই যাতে জামাত জানতে পারে যে এই জামাতে সামিল হওয়াকেই যথেষ্ট বলে মনে করে বসা কিম্বা নিরস ঈমানে সন্তুষ্ট হয়ে পড়া উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য ও সাহায্য তখনই লাভ হবে যখন প্রকৃত তাকওয়ার সঙ্গে পুণ্যকর্মও যুক্ত হবে।'

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আরও বলেন: যুগের পরিস্থিতি অত্যন্ত দ্রুত অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকারের শিরক, এর ক্ষতিকর দিকগুলি এবং বিদাত প্রকাশ পাচ্ছে। বয়আতের সময় খোদার সামনে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়। অতএব শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সেই অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকুন। অন্যথায় মনে করুন কখনও বয়াতই করেন নি।

কিন্তু যদি এই অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তবে অবশ্যই খোদা আপনাদের জাগতিক ও ধর্মীয় বিষয়াদিতে কল্যাণ করবেন। খোদার অভিপ্রায় অনুসারে তাকওয়া অবলম্বন কর। আমরা অত্যন্ত ভয়াবহ সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছি যখন কিনা ঐশী শাস্তি প্রকাশিত হচ্ছে। যে ব্যক্তি নিজেকে খোদা তা'লার ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত করে, খোদা তা'লা তার প্রতি এবং তার ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রতি দয়ার আচরণ করবেন।"

আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমার জুমার খুতবা মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং বোঝার চেষ্টা করবেন এবং আমার নির্দেশাবলী পালন করার চেষ্টা করবেন। এটি আপনাদের ঈমান এবং খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্ককে দৃঢ় করবে। আজ ইসলামের পুনর্জীবন এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা কেবল খিলাফত ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমেই সম্ভব। এই কারণে আপনাদের উচিত সব সময় এই ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা আর আপনার ভবিষ্যত প্রজন্ম যেন সব সময় খিলাফতে আহমদীয়ার আশিসময় ছায়ার আশ্রয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের জলসাকে সফল করুন। আপনাদেরকে বয়আতের শর্তাবলী পূর্ণ করার তৌফিক দিন, তাকওয়া এবং আধ্যাত্মিকতায় সব সময় উন্নতি করতে থাকার তৌফিক দিন। আল্লাহ্ আপনাদের সকলের জীবনে এমন পরিবর্তন নিয়ে আসুন যেন আপনারা তাকওয়া, পুণ্যকর্ম, খিদমতে দ্বীন এবং মানব সেবার উন্নত মান অর্জনকারী হন। আল্লাহ্ আপনাদের সকলের উপর কৃপা করুন। আমীন

ওয়াসসালাম খাকসার

মির্যা মসরুর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ আল খামিস।

ইমামের বাণী

"কুরআন শরীফ অনুধাবন করার এবং সেই অনুসারে হিদায়াত পাওয়ার জন্য তাকওয়াই মূল।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)

৬ই আগষ্ট ১৯৪৫

সভ্যতার ইতিহাসের একটি অভিশপ্ত দিন

মূল: আনিস আহমদ নাদিম, মুবাল্লিগ ইনচার্য , জাপান

অনুবাদ: মির্যা সফিউল আলম

৬ই আগষ্ট ১৯৪৫ সালের এই দিনটি সভ্যতার ইতিহাসে একটি নিষ্ঠুর দিন হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকবে। এই দিনটিতেই মিত্র বাহিনী জাপানের হিরোসিমা শহরে পরমাণু বিস্ফোরণ করে। শত সহস্র মানুষ এক লহমায় মৃত্যুপুরীতে পৌঁছে যায়। আহমদীয়াতের ইতিহাসবিদ এই বেদনায়দায়ক ঘটনার উল্লেখ করে লিখেন,

'যেরূপ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কে ইলহামের মাধ্যমে অবগত করানো হয়েছিল যে,

" সেই সমস্ত শহর গুলিকে দেখে মানুষ শোকস্তব্ধ হয়ে পড়বে।"

এই করুণ দৃশ্য জাপানের আকাশ প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিল।"

(উদ্ধৃতি- তারিখ আহমদীয়াত, ৯ম খণ্ড-পৃষ্ঠা-৫১৯-৫২০)

৬ই আগষ্ট-এর পরমাণু আক্রমণের সংবাদ ৮ই আগষ্ট সকালে মার্কিন রেডিও- তে শোনা যায় এবং সেই সময় পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশই এ বিষয়ে অজ্ঞাত ছিল যে হিরোশিমায় পরমাণু আক্রমণের জেরে এমন কিয়ামত সদৃশ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। জাপানের নাগরিক এবং পৃথিবীর সকল বুদ্ধিজীবি ও পথ প্রদর্শকরা যখন এই ধ্বংস মূলক ঘটনার বিশ্লেষণ করতে বসেছিলেন, ঠিক সেই সময় সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) ১০ আগস্ট ১৯৪৫ ডালহৌসিতে একটি খুতবা প্রদান করেন। সেই খুতবায় তিনি পরমাণু বোমার প্রয়োগের বিরুদ্ধে জোরালো ভাষায় প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন,

" আমাদের এই ঘোষণাকে সরকার অপছন্দ করলেও আমাদের ধর্মীয় এবং নৈতিক কর্তব্য হল পৃথিবীর সামনে এই ঘোষণা দেওয়া যে, আমরা এমন রক্তপাতকে বৈধ বলে গণ্য করি না।"

তিনি আরও বলেন, "এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, ভবিষ্যতে যুদ্ধ-বিগ্রহ হ্রাস পাবে না বরং তা বৃদ্ধি পাবে। আর যারা এমনটি মনে করে যে, পরমাণু বোমার মাধ্যমে মহাশক্তি গুলি আরও শক্তি শালী হয়ে উঠবে এবং তাদের প্রতিদ্বন্দিতায় অন্য কোন সামরিক শক্তি উঠে দাঁড়াবে না-এটি নেহাতই শিশু সুলভ ধারণা। স্মরণ রেখো! খোদার রাজত্ব অনন্ত এবং খোদার লস্কর সম্পর্কে খোদা ব্যতিত কেউ অবগত নয়। আল্লাহ তা'লা কুরান মজীদে বলেন- مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ অর্থাৎ তোমার প্রভু প্রতিপালকের লস্কর সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ অবগত নয়। যদি কিছু মানুষের হাতে পরমানু বোমা এসে থাকে, তবে আল্লাহ তা'লা শক্তি রাখেন যে তিনি কোন বিজ্ঞানীকে এমন কোন বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করবেন এবং সে এমন কোন উদ্ভাবন করবে যা পৃথিবীতে আরও ব্যপক ধ্বংস ডেকে আনবে এবং সে পরমানু আক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে আরম্ভ করবে। "

হুযুর এই প্রসঙ্গে বিশ্ববাসীকে আঁ হযরত (সাঃ) বর্ণিত একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, 'আগুনের শাস্তি দেওয়া আল্লাহর কাজ। নিজেদের শত্রুদেরকে আগুনের মাধ্যমে শাস্তি ও কষ্ট দেওয়ার উপায় অবলম্বন করা মুসলমানদের উচিত নয়।' তিনি (রাঃ) বলেন, 'তেরো শত বছর পূর্বে রসুলুল্লাহ (সাঃ) পৃথিবী বাসীকে যুদ্ধ বিগ্রহ হ্রাস করার পথ বলে দিয়েছিলেন। যতদিন জগতবাসী সেই পথ অবলম্বন না করে, যুদ্ধ থামবে না বরং তা বেড়েই চলবে। আমেরিকা ও ইউরোপবাসী ততদিন শান্তি পাবে না যত দিন পর্যন্ত না তারা আঁ হযরত (সাঃ) এর এই শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হবে। যত দিন পর্যন্ত না তারা আঁ হযরত (সাঃ) এর নির্দেশ অনুসারে আগ্নেয়াস্ত্রকে অবৈধ ঘোষণা দিবে। ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত শান্তি ভাগ্যে জুটবে না। (তারিখে আহমদীয়াত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫১৯-৫২০)

হিরোশিমায় পরমানু আক্রমণের বিরুদ্ধে এটি প্রথম প্রতিবাদ ধ্বনি ছিল। এর পর ইউরোপ এবং সারা বিশ্বে এই ঘটনার নিন্দার ঝড় ওঠে।

* ১৯৮৯ সালের ঐতিহাসিক ক্ষণে যখন জামাতে আহমদীয়ার শতবর্ষ পূর্তি হচ্ছিল তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহঃ) জাপান পরিভ্রমণে আসেন। তিনি (রহঃ) সেই সময় বিশেষভাবে হিরোশিমা শহর পরিদর্শন করেন এবং পরমানু বোমার দ্বারা আক্রান্ত ও প্রভাবিত ব্যক্তিদের ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে অত্যন্ত ভাব বিহ্বল হয়ে ওঠেন।

হুযুর (রহঃ) পিস পার্ক গিয়ে মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন। এই মিউজিয়ামে পরমানু তেজস্ক্রিয়তার ফলে ধ্বংসের চিত্র ও ধ্বনি সাজানো ছিল। হুযুর (রহঃ) মিউজিয়ামের বাইরে হুইল চেয়ারে বসা একজন বিকলাঙ্গ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করে তার খোঁজ খবর নেন। এবং তাকে কিছু নগদ পয়সাও প্রদান করেন। হিরোশিমা শহরে রেডিও হিরোশিমার প্রতিনিধি হুযুরের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকার প্রদান কালে হুযুর (রহঃ) গভীর শোক ও বেদনা ব্যক্ত করেন।

* সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) ২০০৬ সালের মে মাসের তার জাপান পরিভ্রমণ কালে হিরোশিমা শহরের এই মিউজিয়ামটি পরিদর্শন করেন। এখানে এসে তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন,

" আজকে হিরোশিমা মিউজিয়াম দেখলাম। হৃদয়কে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে দেওয়ার মত একটি ঘটনা। নিঃসন্দেহে হিরোশিমার নাগরিকরা প্রশংসার পাত্র যারা অত্যন্ত উদ্যমশীলতার সঙ্গে সেই সংকটময় সময় অতিবাহিত করে এসেছেন। আর আজকে তারা পুণরায় একটি বিরাট শহর গড়ে তুলেছে। আর সর্বোপরি তারা নিজেদের শত্রুদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছে। এই শহরের মানুষদেরকে কুর্নিশ জানাই।

মির্যা মসরুর আহমদ।

(হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস আইঃ) বলেন,

Today I happpened to visit Hiroshima Museum.After having seen the exhibited things it is unbearable for me to control the overwhelming sentiments. People of Hiroshima are really praise worthy who have very bravely passed through this painful episode. I salute the people of Hiroshima.

Mirza Masroor Ahamad
Head of Ahmadiyya in Islam

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস ২০০৬ সালের মে মাসের এই পরিদর্শন কালে হিলটন হোটেল টোকিওতে অনুষ্ঠিত একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রদান কালে বলেন,

" জাপানী জাতি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ভয়াবহতাকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছে। এই কারণে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে তারা বেশি অনুমান করতে পারবে। আমি জাপানি জাতিকে বলতে চাই, আপনারা এগিয়ে এসে পৃথিবীকে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের বিপদ থেকে উদ্ধার করার ভুমিকা পালন করুন।"

(অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে ভাষণ, ৯ই মে ২০০৬ সাল, স্থান: হিলটন হোটেল, টোকিও)

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) একটি বিশাল জন সমাবেশের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান কালে জাপানি জাতি ও তাদের নেতৃবৃন্দকে উপদেশ দিয়ে বলেন,

" এই যুগে কিছু ক্ষুদ্র দেশের কাছেও পরমানু অস্ত্র মজুত আছে। এই সব অস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীদের হাতে চলে যাওয়াও আশ্চর্যের কিছু নয়। আর এই সব অস্ত্রের ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি পৃথিবী বাসীকে এই ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করার চেষ্টা করছি। আমি আপনাদের সকলের কাছে এই আবেদনই করব যে, পৃথিবীতে শান্তির প্রসারে যথাসম্ভব চেষ্টা করুন। নিজের নিজের দলকেও অবগত করুন যে, জুলুম-অত্যাচার এবং চরম পন্থা অবলম্বন করা এবং পরস্পরকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখার পরিবর্তে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখা উচিত। যেখানেই আমরা অত্যাচার দেখি না কেন অত্যাচারীকে তৎক্ষনাৎ নিরস্ত করে অন্যায়-অত্যাচারের অবসান ঘটানোর চেষ্টা করা উচিত। জাপানি জাতি এবং জাপানি নেতৃবর্গের মধ্যে অন্যান্য জাতিকে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার গুরুত্বকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করানোর সামর্থ্য ও শক্তি আছে। আপনারা পরমানু বোমার ধ্বংসাত্মক প্রভাব এবং এর পরিণতিতে সংঘটিত রক্তপাত সম্পর্কে সবিশেষ অবগত আছেন। আপনার আধুনিক যুগের যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সব থেকে ভাল বোঝেন।"

(জাপানী রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিজীবির উদ্দেশ্যে ভাষণ: ৯ ই নভেম্বর, ২০১৩, স্থান: নাগোয়া)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) জাপানী রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিজীবির উদ্দেশ্যে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

" আপনারা হলেন সেই জাতি যারা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে সব থেকে বেশি ক্ষতি গ্রস্ত হয়েছেন। এখন তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধকে থামানোর জন্য পদক্ষেপ নিন। খোদা তা'লা আপনাদের সহায় হোন। প্রত্যেক আহমদী এই দোয়াই করে থাকেন যে, হে খোদা ত'লা ! এই সুন্দর পৃথিবীকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা কর। মানুষদের বিবেক-বুদ্ধি দান কর, তারা যেন নিজেদের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে।"

(অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে ভাষণ, ৯ ই মে, ২০০৬, স্থান: হিলটন হোটেল, টোকিও)

ইমামের বাণী

" যে ব্যক্তি ইসলামের সম্মানের জন্য আত্মাভিমান রাখে না, খোদা তা'লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali, Amir Birbhum District

হযরত মুসলেহ মওউদ (সাঃ) সংক্রান্ত একটি মহান ঐশী নিদর্শনের পটভুমি এবং গুরুত্ব

এহসানুল্লাহ দানিশ, মুরুব্বী সিলসিলা

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁর যুগে জ্ঞানভিত্তিক, যুক্তিভিত্তিক এবং প্রমাণভিত্তিক দিক থেকে জয়যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি ১৮৮৫ সালে ইসলামের সত্যতা এবং ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সাঃ) এর সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য অমুসলিমদের কাছে নিদর্শন দেখার আহ্বান জানান এবং বিশেষ করে নিজের বিরোধীদেরকে এবং ইসলামের অস্বীকারকারীদেরকে সম্বোধন করে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, 'যে ব্যক্তি সত্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে এসে এক বছর সময় কাল পর্যন্ত অতিবাহিত করবে, তাকে খোদা তা'লা এমন নিদর্শন দেখাবেন যা তার উপর আঁ হযরত (সাঃ) এর সত্যতা প্রকাশ করে দিবে। তিনি (আঃ) এ বিষয়ে সারা পৃথিবীতে ইশতেহার প্রচার করেন।

এর প্রতিক্রিয়ায় কাদিয়ানের আর্য এবং অন্যান্য অ-মুসলিমরা তাঁর নিকট পত্র মাধ্যমে নিবেদন করেন যে, আমরা যেহেতু আপনার সঙ্গেই সহাবস্থান করি, অতএব অন্যদের তুলনায় আমরা নিদর্শন দেখার বেশি অধিকার রাখি। তারা লিখেন-" যেরূপ পরিস্থিতিতে আপনি লন্ডন এবং আমেরিকা পর্যন্ত এই বিষয়টির রেজিস্টার্ড পত্র প্রেরণ করে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন যে,আপনাদের মধ্যে যারা সত্যসন্ধানী আছেন এবং তারা যদি এক বছর কাল পর্যন্ত আমার কাছে কাদিয়ানে এসে অবস্থান করেন খোদা তা'লা তার উপর ইসলামের সত্যতার নিদর্শন অবশ্যই প্রকট করে দিবেন যা মানবীয় শক্তির উর্দ্ধে। আমরা আপনার একই শহরের বাসিন্দা এবং প্রতিবেশি। লন্ডন এবং আমেরিকার অধিবাসীদের তুলনায় আমাদের এই অধিকার আমাদের বেশি প্রাপ্য। আমরা আপনার নিকট কসম খেয়ে বলতে পারি যে আমরা যেহেতু সত্যান্বেষী অতএব, আমাদের জন্য এতটুকু নিদর্শনই যথেষ্ট যার জন্য আকাশ ও পৃথিবীকে ওলট পালট হতে হয় না, প্রকৃতরি নিয়ম উল্লঙ্ঘন করার প্রয়োজন হয় না। তবে এতটুকু নিদর্শন অবশ্যই চাই যা মানবীয় শক্তির উর্দ্ধে। যার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সেই সত্য ও পবিত্র পরমেশ্বর আপনাকে সত্য পথের দিশা দিতে অকৃত্রিম ভালবাসা এবং করুনাবশতঃ আপনার দোয়া সমূহকে গ্রহণ করে থাকেন এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার পূর্বাহ্নেই সে সম্পর্কে অবগত করেন কিম্বা আপনাকে কিছু গোপন বিশেষ রহস্যাবলী সম্পর্কে অবগত করেন অথবা এমন অনন্য পন্থায় আপনার সাহায্য ও সমর্থন করেন যেরূপে তিনি আদিকাল থেকেই তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত, তাঁর দরবারে সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ, তাঁর ভক্তবর্গ এবং বিশেষ বান্দাদের সঙ্গে করে থাকেন। "

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯২-৯৩)

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এই পত্রের উত্তরে লেখেন,

" আপনাদের পত্র প্রাপ্ত হয়েছি যাতে আপনারা ঐশী নিদর্শন দেখার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। আমি পূর্ণ কৃতজ্ঞতসহকারে এই বিষয়টিকে মঞ্জুর করছি। এবং আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আপনারা যদি এই অঙ্গিকার সমূহ রক্ষা করার প্রতি সৎ থাকেন যেগুলি আপনারা পত্রে উল্লেখ করেছেন তবে অবশ্যই এক বছরের মধ্যে মহা শক্তিশালী আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন এমন নিদর্শন প্রকাশ করবে যা মানবীয় শক্তির উর্দ্ধে হবে। হে মহাশক্তিশালী ও দয়াময় খোদা আমাদের ও তাদের মধ্যে সত্য মীমাংসা কর এবং তুমিই সর্বোত্তম মীমাংসাকারী। তুমি ভিন্ন কেউ মীমাংসা করতে পারে না। আমীন সুম্মা আমীন॥"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৫-৯৬)

সুতরাং হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা বিরোধী ও অস্বীকারকারীদেরকে নিরুত্তর করে দেন। এবং ইসলামের সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর নির্দেশে চিল্লাহ কশি এবং বিশেষ দোয়ার উদ্দেশ্যে কাদিয়ান থেকে হোশিয়ারপুরের যাত্রা করেন এবং পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'লার দরবারে এক মহান নিদর্শন প্রকাশের জন্য দোয়ায় ডুব দিলেন। আল্লাহ তা'লা তাঁর দোয়া গ্রহণ করেন এবং অসাধারাণ গুণাবলী ও আল্লাহর কৃপাভাজন এক মহান পুত্র সন্তান প্রদান করার শুভসংবাদ দেন। এই শুভ সংবাদ তিনি (আঃ) ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ সালে একটি ইশতেহারের মাধ্যমে প্রকাশ করেন।

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে দু'জন পুত্র সন্তানের সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। যাদের মধ্যে একজনের জন্য বাল্যকালেই মৃত্যু নির্ধারিত ছিল। অপরদিকে দ্বিতীয়জন অসাধারণ জীবন লাভ করবে বলে উল্লেখ ছিল। সে অসাধারণ গুণের অধিকারী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। ভবিষ্যদ্বাণীতে একথারও উল্লেখ ছিল যে, সে পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত পর্যন্ত খ্যাতি লাভ করবে। জাতি সমূহ তার থেকে বরকত লাভ করবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আল্লাহ তা'লা মসীহ মওউদ (আঃ) এর পুত্রের জন্য এমন বহু অসাধারণ গুণাবলীর ধারক হওয়ার শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন যেগুলির মধ্যে একটি গুণও এমন নয় যা মানবীয় হস্তক্ষেপের কারণে পূর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল এবং কোন ব্যক্তিই নিজের সন্তান সম্পর্কে এমন নিজের পক্ষ থেকে এমন দাবী করতে পারে না যে সে এই ধরণের গুণাবলীর অধিকারী হবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীকে মৃতদের জীবিত করার নিদর্শন অপেক্ষা শত সহস্র গুণ শ্রেয় বলে আখ্যায়িত করে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন,

" এখানে চক্ষু উন্মিলিত করে দেখা দরকার যে, এটি কেবল একটি ভবিষ্যদ্বাণীই নয় বরং একটি মহান ঐশী নিদর্শন যা মহা পরাক্রমশালী ও সম্মানিত খোদা তা'লা আমাদের নবী করীম (সাঃ)-এর সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য প্রদর্শন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই নিদর্শন একজন মৃতকে জীবিত করা অপেক্ষা শত সহস্র গুণ শ্রেয় ও পূর্ণ। এই স্থানে আল্লাহর কৃপায় হযরত খাতামুল আম্বিয়া (আঃ) -এর কল্যাণে আল্লাহ তা'লা এই অধমের দোয়াকে গ্রহণ করে এমন কল্যাণময় জীবন প্রেরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন কল্যাণ সমগ্র পৃথিবীতে প্রসার লাভ করবে। তথাপি যদিও এই নিদর্শন মৃতদের জীবিত করার সদৃশ প্রতীয়মান হয় কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে যে, এই নিদর্শন মৃতদের জীবিত করা অপেক্ষা সহস্রগুণ উত্তম। দোয়ার মাধ্যমে মৃতের আত্মাই তো ফিরে আসে এবং এখানেও দোয়ার মাধ্যমে একটি আত্মাকেই আহ্বান করা হয়েছে। কিন্তু এই সকল আত্মা এবং সেই আত্মার মধ্যে যোজন যোজন দূরত্ব রয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে যারা গোপনে ধর্মচ্যুত তারা আঁ হযরত (সাঃ)-এর অলৌকিক নিদর্শনাবলী প্রকাশ পেতে দেখে আনন্দিত হয় না বরং তারা এই ভেবে বড়ই বিষন্ন হয় যে এমনটি কেন ঘটল।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯২-৯৩)

ইসলামের বিরোধী বিশেষ করে হিন্দুদের জন্য এই বিষয়টি যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাদের আবেদন স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং ঐশী নিদর্শনের জন্য প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু শত্রুতা এবং বিদ্বেষ মানুষের দৃষ্টি শক্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ঠাট্টা-বিদ্রুপ এবং শত্রুতা মানুষকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। সুতরাং ইসলামের একজন ঘোর বিরোধী সত্যকে গোপন করার এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে।....অর্থাৎ পন্ডিত লেখরাম পেশাওয়ারী। ... যে পূর্বেও আঁ হযরত (সাঃ) এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অপলাপ করার জন্য কুখ্যাত ছিল। যখন হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ১৮৮৫ সালে অ-মুসলিমদেরকে নিদর্শন দেখার জন্য আহ্বান জানান তখন লেখরামও ১৮৮৫ সালে সেই নিদর্শন দেখার জন্য কাদিয়ানে আসে। কিন্তু কিছু দিন বিরোধীদের কাছে থেকে নিজের কদর্যতার পরিচয় দিয়ে ফিরে যায়। তথাপি সে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) -এর নিকট বারংবার নিদর্শন দেখতে চায়ত। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে জ্ঞাত হয়ে যখন অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্পন্ন অতুলনীয় মহান এক প্রতিশ্রুত পুত্র সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যিনি তাঁরই বংশধর হবেন বলে উল্লেখ করেন এবং যার সম্পর্কে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তিনি জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে বলেন যে, সেই পুত্র নয় বছর কালের মধ্যে ভুমিষ্ঠ হবে এবং যার পবিত্র জীবনের প্রতিটি মূহূর্ত ইসলামের সত্যতার প্রমাণ হবে। সেই সময় লেখরাম সততা এবং খোদা ভীরুতা অবলম্বন না করে অত্যন্ত কদর্য ভাষা প্রয়োগ করতে শুরু করে। ইসলামের সত্যতার জন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। সত্যতা এবং সত্যান্বেষণের দাবী মেনে খোদা তা'লা দু'পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষের সত্যতা প্রকাশ করেন তার জন্য অপেক্ষা করা উচিত ছিল। কিন্তু লেখরাম অধৈর্য্যতার পরিচয় দেয় এবং মীমাংসার পূর্বেই ঠাট্টা-বিদ্রুপ আরম্ভ করে। সে তার ইশতেহারে একথাও লিখে ফেলে যে, প্রতিশ্রুত পুত্রের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া তো দূরের কথা, খোদা তা'লা আমাকে অবগত করেছেন যে, মির্যা সাহেবের কোন সন্তান হবে না এবং তিন বৎসর কালের মধ্যে অবিশিষ্ট বংশধরেরাও ধ্বংস হবে এবং তিনি নিঃসন্তান থাকবেন।

(তাকযীব বারাহীনে আহমদীয়া, মুসাফ্ফা লেখরাম, পৃষ্ঠা-৩১১)

ঐশী আদেশ অনুসারে এই মহান পুত্র হযরত আম্মাজান নুসরাত জাহান বেগম সাহেবার গর্ভ হতে ১৮৮৯ সালের ১২ জানুয়ারী শনিবার রাত্রি ১০টার সময় ভুমিষ্ঠ হয়। এইরূপে লেখরাম তার শয়তানি ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা হতে দেখে। সেই ভবিষ্যদ্বাণীতে সে প্রকাশ করে যে, পরেমশ্বর তাকে জানিয়েছে, প্রতিশ্রুত পুত্র জন্ম নেওয়া দূরস্থান, মির্যা সাহেব নিঃসন্তান

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 13 June, 2019 Issue No.24

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

থাকবেন। লেখরাম হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সম্পর্কে যা কিছু বলেছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে খোদার আত্মাভিমান তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। যে দিন হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর জন্ম হয় সেই দিনেই হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বয়াতের শর্তাবলীর ঘোষণা করার মাধ্যমে জামাতের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এবং এই ভাবেই লেখরামের ভবিষ্যদ্বাণী বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। আজকে কোটি কোটি মানুষ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আধ্যাত্মিক পুত্র হিসেবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। এবং খোদার ইলহাম 'ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার' পূর্ণ হয়েছে।

কিন্তু কেবল এতটুকুই নয়, বরং খোদা তা'লার তকদীর শত্রুদেরকে তাদের নিজেদের হাসি-বিদ্রুপ এবং ত্বরা পরায়ণতার কারণে তাদেরকে একটি প্রতাপান্বিত নিদর্শন দেখানোর উপকরণ সৃষ্টি করে। প্রারম্ভে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) লেখরাম পেশাওয়ারীকে বিশেষ এই কারণে মনে করেন নি যে আর্যদের মধ্যে কিছু সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে পূর্বেই বিষয়টি নিয়ে চুক্তি হয়ে যায়, সে কারণে কোন একক ব্যক্তির জন্যও সেই নিদর্শনই যথেষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু লেখরামকে নিয়ে হিন্দু সমাজ আশার আলো দেখছিল। সে তার ভাষার বাগ্মিতা ও কদর্যতার কারণে সারা ভারতব্যাপী কুখ্যাতি অর্জন করতে শুরু করে এবং ক্রমেই তারা লেখরামকে নিজেদের প্রতিনিধি বানিয়ে ফেলে। পন্ডিত লেখরাম প্রকাশ্যে এই ঘোষণাও দিত যে, আমার বিপক্ষে যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে সেটি প্রকাশ করে দিতে পার, আমার পক্ষ থেকে অনুমতি আছে। এর ফলে হিন্দু জাতির তাকে দেওয়া নতুন সম্মান ও মর্যাদা এবং অশালীন ভাষা ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষন করে। তিনি (আঃ) আল্লাহর দরবারে লেখরাম সম্পর্কে ফয়সালা চান। আলাহ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কে ইলহাম করে বলেন, عِجْلٌ جَسَدٌلَّهٗخُوَارٌلَهٗنَصَبٌوَّعَذَابٌ

অর্থাৎ এটি একটি নিঃষ্প্রাণ গোয়াল, যার মধ্য থেকে একটি কর্কশ শব্দ বেরিয়ে আসছে। এবং এর জন্য এই অভদ্রতা ও দুর্মুখতার প্রতিফলে শাস্তি ও দুঃখ নির্ধারিত আছে যা অবশ্যই সে প্রাপ্ত হবে।

(ইশতেহার ২০ শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩, তবলীগে রিসালত, ৩য় খণ্ড, রূহানী খাযায়েন ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫০)

এবং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) স্পষ্ট করে দেন যে, يُقْضٰى اَمْرُهٗ فِىْ سِتٍّ অর্থাৎ লেখরামের বিষয়টির নিষ্পত্তি ছয়ের (ছয় বছর) মধ্যে হবে।

(ইসতেফতা, রূহানী খাযায়েন, দ্বাদশ তম খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৫)

এর পর ২র এপ্রিল ১৮৯৩, মোতাবেক ১৪ রমযান ১৩১০ হিজরী, সকাল বেলা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কে কাশফের মাধ্যমে অবগত করা হয় যে, একজন শক্তিশালী , বলিষ্ঠ ও ভয়ানক চেহারার ব্যক্তিকে লেখরামের নিধনের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে যার চেহারা থেকে রক্ত ঝরছে।

(বারকাতুদ্দোয়া, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৩)

এর পর ১৮৯৩ সালে তিনি তাঁর পুস্তক কিরামাতুস সাদেকীন-এ লিখেন: وَبَشَّرَنِىْ رَبِّىْ وَقَالَ مُبَشِّرًا سَتَعْرِفُ يَوْمَ الْعِيْدِ وَالْعِيْدُ اَقْرَبُ

অর্থাৎ- লেখরামের মৃত্যু সম্পর্কে খোদা তা'লা আমাকে সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন, অচিরেই তুমি সেই ঈদের দিনটিকে সনাক্ত করবে এবং প্রকৃত ঈদের দিনও সেই দিনটির নিকটবর্তী হবে।

কিন্তু তবুও লেখরাম হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে ধর্তব্যের মধ্যে মনে করত না। এই কারণে সে ক্রমাগত আস্ফালন ও দুর্বৃত্তিতে অধঃপতিত হতে থাকে। তার নিজের পূর্বের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের পরিণাম দেখা সত্বেও সে কিঞ্চিত লজ্জাবোধ করে নি। অবশেষে সে মিথ্যা আস্ফালন,শত্রুতা ও বিদ্বেষের সীমা ছাড়িয়ে যায়। সে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত সমস্ত শর্ত পূরণ করার পর লাহোরে ৬ মার্চ ১৮৯৭ সালে সন্ধ্যা ৬টার সময় এক অজ্ঞাত ব্যক্তির হাতে ছুরিকাঘাতে নিহত হয়। আর এই দিনটি ছিল ঈদের দ্বিতীয় দিন।

কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণীটি থেকে হিন্দুরা বিশেষ করে আর্যরা কোন শিক্ষা গ্রহণ না করে খুবই হৈ-চৈ বাধায়, এই বলে যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাকে হত্যা করিয়েছেন এবং হিন্দু সংবাদ পত্রে এই ঘটনাটিকে প্রকাশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ষড়যন্ত্র হিসেবে অভিহিত করে। এবং বিভিন্ন ধরণের মিথ্যা যুক্তি সাজাতে থাকে। কিন্তু খোদার তকদীরের সাথে মানুষ কি কখনও মোকাবিলা করতে পারে?

যখন এই বিতর্ক তুমুল রূপ ধারণ করে তখন হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) লেখরাম সম্পর্কে আর্যদের চিন্তাধারা বিষয়ক একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন যাতে তিনি (আঃ) তাদেরকে পুনরায় ঐশী সিদ্ধান্তের দিকে আহ্বান জানান। তিনি (আঃ) বলেন,

" যদি এখনও কোন ব্যক্তির সন্দেহ দুর না হয় এবং আমাকে এই হত্যার ষড়যন্ত্রকারী মনে করে যেরূপ হিন্দু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে, তবে আমি একটি সৎ পরামর্শ দিচ্ছি যার দ্বারা পুরো ঘটনার মীমাংসা হয়ে যাবে। সেটি হল, এমন ব্যক্তি আমার সামনে কসম খেয়ে বলুক যে, আমি নিশ্চিতরূপে জানি যে, এই ব্যক্তি (মির্যা সাহেব) হত্যার ষড়যন্ত্রে যুক্ত আছে এবং এরই আদেশে এই হত্যা সম্পাদিত হয়েছে। অতএব যদি এটি সত্য না হয় তবে হে মহাশক্তিমান খোদা! এক বছরের মধ্যে আমার উপর ভয়ানক শাস্তি অবতীর্ণ কর। কিন্তু এই শাস্তি যেন কোন মানুষের হাতের দ্বারা না হয়, আর না এর মধ্যে মানুষের ষড়যন্ত্রের কোন হস্তক্ষেপ আছে বলে ধারণা করা যায়। অতএব এই ব্যক্তি (শপথ গ্রহণ কারী) যদি এক বছর পর্যন্ত আমার বদ দোয়া থেকে সুরক্ষিত থেকে যায় তবে আমি অপরাধী এবং সেই শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হব যা একজন হত্যাকারীর জন্য হওয়া উচিত। এখন যদি কোন দুঃসাহসী আর্য থেকে থাকে যে উপরোক্ত শর্তাবলীর সাথে গোটা দুনিয়াকে সন্দেহ থেকে মুক্তি দিবে তবে সে যেন এই পথটি অবলম্বন করে।

(ইশতেহার, ১৫ মার্চ,১৮৯ ৭)

এর প্রতিক্রিয়ায় গঙ্গা ভুষণ ছাড়া কোন হিন্দুই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য সামনে আসে নি। কিন্তু গঙ্গা ভুষণ তার নিজের শর্ত আরোপ করতে থাকে এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তার শর্তাবলীকে স্বীকার করেও নেন। সে যখন দেখল যে আমার যাবতীয় প্রকারের অন্যায় শর্তাবলীকেও তিনি (আঃ) স্বীকার করে নিচ্ছেন এবং রক্ষা পাওয়ার কোন পথ খোলা রাখছেন না তখন সে মোকাবিলা থেকে পলায়ন করে নিজের জীবন রক্ষা করে।

(বিশদে জানতে 'হায়াতে তৈয়্যবা' পৃষ্ঠা-১৬৯-১৭১ দেখুন)

প্রতাপান্বিত ঐশী নিদর্শন হিসেবে একদিকে পন্ডিত লেখরাম পেশাওয়রীর মৃত্যু এবং গঙ্গা ভুষণের অসম্মানজনক চুক্তির করুণ পরিণাম এবং অপরদিকে আঁ হযরত (সাঃ)-এর সত্যতার প্রমাণ ও শ্রেষ্ঠতার নিদর্শন হিসেবে প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী দ্রুত বেড়ে ওঠা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে থাকে।

এমনিতেই হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এবং তাঁর জামাতের বুযুর্গগণ এই বিশ্বাসের উপর অটল ছিলেন যে হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবই সেই প্রতিশ্রুত পুত্র এবং হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব নিজেও জানতেন কিন্তু তবুও তিনি আল্লাহ তা'লার কাছ থেকে সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত এই দাবী থেকে বিরত থাকেন।

****

যুগ খলীফার বাণী

"আমরা প্রকৃত আহমদী তখনই হতে পারব যখন অস্থায়ী ও জাগতিক কামনা-বাসনা এবং আনন্দ-উপভোগকে নিজেদের উদ্দেশ্য পরিণত করব না।"

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ৫ই মে, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

ইমামের বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam, Amir Jalpaiguri District

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir